ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয় কারো 'পরে

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭৩ বর্ষ | ১৯তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ২ বৈশাখ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ | ১০ জমাঃ আউঃ ১৪৩২ হিজরি | ১৫ শাহাদাত, ১৩৯০ হি. শা. | ১৫ এপ্রিল, ২০১১ ঈসাব্দ

এবারের আহমদীয়া শান্তি পুরস্কার পেলেন
ঈধি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা
আব্দুল সাত্তার ঈধি

আহমদীয়া শান্তি পুরস্কার ২০১১ প্রদান অনুষ্ঠানের কয়েকটি আলোকচিত্র

সম্প্রতি মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব সন্তোষপুর ও ঈশ্বরদী মসজিদ উদ্বোধন করেন নিম্নে তারই কিছু আলোকচিত্র

মসজিদে মোবারক, সন্তোষপুর, উথুলী, কুষ্টিয়া

মসজিদুল মাহ্‌দী, নূরনগর, ঈশ্বরদী

Amecon
Since 1985
www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office
Palbari More, New Khairtola
Jessore. Tel : 67284

Bogra Office
Kanas Gari, Sherpur Road
Bogra. Tel : 73315

Chittagong Office
205, Baizid Bostami Road
Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

শান্তি প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অনন্য উদ্যোগ
শান্তি পুরস্কার প্রবর্তন
এবারের পুরস্কারটি পেলেন ঈধি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা

আব্দুল সাত্তার ঈধি–অভিনন্দন তাঁকে

mPxc Î

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো–প্রেম-প্রীতি, ভালবাসার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। এ লক্ষ্য অর্জনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যগণ ব্যষ্টি ও সামষ্টিক পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে, সঠিক পথের দিশা দিচ্ছে পথহারা মানুষকে।

Love For All
Hatred for None

ভালবাসা সবার তরে ঘৃণা নয় করো 'পরে –

প্রেমময় এই অমোঘ বাণী নিয়ে মানবতার সেবায় নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, পূরণ করে চলছে মানুষের ইহজাগতিক ও পারলৌকিক নানাবিধ চাহিদা ও প্রয়োজন।

পবিত্র কুরআন বলে 'হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী হিসেবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। আর কোন জাতির শত্রুতা তোমাদের যেন কখনো অবিচার করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা সদা ন্যায়বিচার কর। এ (কাজটি) তাক্ওয়ার সবচেয়ে নিকটে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ পুরোপুরি অবহিত।'

(সূরা আল মায়েদা : ৯)

এটাই হলো সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার রূপ-রেখা। কখনো ন্যায়বিচার থেকে বিচ্যুত হয়ো না এমনকি শত্রুর বিচারকালেও নয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও যেভাবে মানবেতর নির্যাতন নিপীড়ন ভোগ করার পর জয় লাভ করেও ন্যায়বিচারের সকল চাহিদা পূরণ করা হয়েছে আজও তেমনি ন্যায়বিচারের সকল প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এরই বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়ে চলছে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত। গত শতাব্দীতে দু'টি বিশ্ব যুদ্ধ হয়ে গেল, এর কারণ বহুমাত্রিক তবে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে শুধু এর একটা কারণই বড় হয়ে দাঁড়ায় এবং তা হল, ন্যায়বিচারের মানদন্ড যথাযথভাবে অনুসৃত হয়নি, প্রতিক্রিয়াস্বরূপ চাপা দেয়া আগুন যা কিনা ধুঁকে ধুঁকে জ্বলছিল পরিণামে বিস্ফোরিত হয়ে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আর পুড়িয়ে ছাড়খার করলো সারা দুনিয়াকে দুই-দুইবার।

অস্থিরতা আজও বেড়েই চলছে এবং যুদ্ধ ও শক্তি প্রয়োগ আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের পূর্বলক্ষণরূপে দেখা দিচ্ছে।

শান্তি রক্ষার জন্য প্রধানতম শর্ত হল ন্যায়বিচার আর ন্যায়বিচারের স্থায়ী শিক্ষা সত্ত্বেও যদি শান্তি প্রচেষ্টা সফল না হয় তখন একত্রিত হও এবং সম্মিলিতভাবে সীমালঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর এবং ঐ সময় পর্যন্ত চালিয়ে যাও যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ সীমালঙ্ঘনকারী শান্তির জন্য সম্মত হয়। ন্যায়বিচারের জন্য আবশ্যক হল প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা পরিত্যাগ করা, বাধা নিষেধ বা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে কোন স্বার্থ সিদ্ধি না করা, সীমালঙ্ঘনকারীর প্রতি নজর রাখা কিন্তু একই সাথে তার অবস্থার উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা চালানো।

পবিত্র কুরআন আরও বলে, ক্ষমতার অহমিকায় দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে না। জনসাধারণের অধিকার পদদলিত করবে না। শাসকদের উচিত খোদার নেয়ামত সদৃশ শাসনক্ষমতা প্রাপ্তির মূল্য বুঝা । আর সে সমস্ত নীতি ও আদর্শ তাদের অনুসরণ করা উচিত যার দৃষ্টান্ত আমরা পেয়ে থাকি হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে। আমরা জানি তিনি কিভাবে ইনসাফ করেছেন। খৃষ্টান রাজত্ব যখন দ্বিতীয়বার প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তারা বিলাপ করছিল আর এই দোয়া করছিল যে, হায়! আবারও যদি কোন মুসলমান আমাদের শাসক নিযুক্ত হতো। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য তথা লিবিয়ার বর্তমান অবস্থা দেখুন, মুসলমান প্রজা-মুসলমান শাসকের বিরুদ্ধে আজ দন্ডায়মান হচ্ছে ইনসাফের নামে। অতএব সেই তাক্ওয়া ও খোদাভীতি প্রয়োজন যা আজ মুসলমানরা হারিয়ে বসেছে। শাসক হউক বা জনগণ উভয় পক্ষ যদি এই মূলনীতিকে আকড়ে ধরে তাহলেই সফল হবে।

বিশ্বে সংঘাতময় পরিস্থিতি বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও ব্যতিক্রমী মহানুভব ব্যক্তিগণ দেশে-দেশে মানবতার জয়গান গেয়ে চলেন। মানব সেবায় নিরলস প্রচেষ্টারত এমন মহানুভবদেরকে কৃতজ্ঞতার সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত স্মরণ করে আর খিলাফতের পক্ষ থেকে তাদেরকে শান্তি পুরস্কার প্রদান করে থাকে।

এবারে এই পুরস্কার লাভ করলেন পাকিস্তানের একজন বিদগ্ধ মানবপ্রেমী-যার প্রতিষ্ঠান ইধি ফাউন্ডেশন সারা পাকিস্তান জুড়ে আর্তমানবতার সেবায় অনবদ্য অবদান রেখে চলেছে। পাকিস্তানের যেকোন স্থানে তাৎক্ষণিক ভাবে অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদানে এ প্রতিষ্ঠানটির জুড়ি নেই। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে নি:স্বার্থ ও নিরলস সেবা প্রদানের কারণে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা ঈধি ফউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল সাত্তার ঈধিকে এবারে আহমদীয়া শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করলেন।

অভিন্দন আব্দুল সাত্তার ঈধিকে সেই সাথে প্রত্যাশা সকল মানুষ এমনিভাবে আর্তমানবতার সেবায় এগিয়ে আসুক, জয় হোক মানবতার।

১৫ এপ্রিল ২০১১

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
জুমুআর খুতবা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	৫
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ৮৭তম সালানা জলসা উপলক্ষে হুযূর (আই.)-এর উদ্বোধনী ভাষণ	১৪
মুফতি মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব প্রদত্ত বাংলাদেশের ৮৭তম সালানা জলসার বক্তব্য	১৮
প্রেস রিলিজ, বৃটেনের সহিষ্ণুতার-নীতির প্রশংসায় মুসলিম নেতা	২২
নৈতিক অবক্ষয় রোধে ইসলামি শিক্ষা মওলানা বশিরুর রহমান, মুরুব্বী সিলসিলাহ	২৬
'সত্যের সন্ধানে'-র অনুষ্ঠান সূচী	২৮
হযরত উমর (রা.) মূল: মাশহুদ আহমদ এবং ফজল আহমদ	২৯
শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেব–একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস অনুবাদ : মোহাম্মদ ফজলুর রহমান	৩১
সংবাদ	৩৩

কুরআন শরীফ

সূরা ইউসুফ-১২

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ۖ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٤﴾

৪৪। বাদশাহ্ বললো, 'নিশ্চয় আমি (স্বপ্নে) মোটাতাজা গাভী দেখেছি, যেগুলোকে সাতটি হ্যাংলা-পাতলা গাভী খাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ-সতেজ শস্যের শীষ ও অন্য (সাতটি) শুক্‌নো শীষও (দেখছি)। হে পারিষদবর্গ! তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারলে আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দাও।'

قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ﴿٤٥﴾

৪৫। তারা বললো, 'এসব এলোমেলো স্বপ্ন এ ধরনের উদ্ভট (স্বপ্নের) ব্যাখ্যা করার জ্ঞান আমাদের নেই।'

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٦﴾

৪৬। আর সেই দুই (কয়েদীর) মাঝে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পর (ইউসুফের কথা যার) মনে পড়লো সে বললো, 'আমি এর ব্যাখ্যা (সম্পর্কে) তোমাদের জানাব। অতএব তোমরা আমাকে (ইউসুফের কাছে) পাঠিয়ে দাও।'

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

৪৭। হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! স্বপ্নে দেখা সাতটি মোটাতাজা গাভী, যেগুলোকে সাতটি হ্যাংলা-পাতলা (গাভী) খাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ-সতেজ শস্যের শীষ এবং অন্য (সাতটি) শুক্‌নো শস্যের শীষ সম্বন্ধে তুমি আমাদের বুঝিয়ে দাও যাতে আমি লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারি যেন তারা (স্বপ্নের ব্যাখ্যা) জানতে পারে।

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٨﴾

৪৮। সে বললো, 'তোমরা একাধারে সাত বছর চাষাবাদ করবে এবং যে ফসল তোমরা কাটবে তা থেকে নিজেদের খাওয়ার জন্য অল্প কিছু রেখে বাকীটা শীষসহ সংরক্ষণ করবে।

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٩﴾

৪৯। এর পরপরই কঠিন সাতটি (বছর) আসবে[১৩৮৪], যা তোমাদের এ (বছর)গুলোর জন্য পূর্ব থেকে জমিয়ে রাখা (শস্যভান্ডার) নি:শেষ করে ফেলবে। তবে সেই সামান্য অংশের কথা ভিন্ন যা তোমরা (ভবিষ্যত চাষাবাদের জন্য) সংরক্ষণ করবে।

১৩৮৪। হযরত নবী করীম (সা.)-এর যুগে আরব দেশ এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছিল যা সুদীর্ঘ সাত বৎসর স্থায়ী হয়েছিল। তা এতই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ছিল যে লোকেরা মৃতের পচা গলিত মাংস পর্যন্ত ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়েছিল (বুখারী)।

হাদীস শরীফ

মিথ্যাচারিতা খোদার অসন্তুষ্টির পথে নিয়ে যায়

কুরআন ঃ

"তোমরা মূর্তিপূজার শিরক থেকে বাঁচো এবং মিথ্যা থেকে দূরে থাকো।" (সূরা হজ্জ ঃ ৩১)

হাদীস ঃ

হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আমি কি তোমাদের তিনটি বড় গুনাহ্ সম্বন্ধে অবগত করবো? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি বলুন।

তিনি (সা.) বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা এবং পিতা মাতার অবাধ্যতা করা, তিনি (সা.) তখন হেলান দিয়ে বসেছিলেন, তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, খবরদার মিথ্যা কথা বলা থেকে বাঁচো ।

তিনি (সা.) এ কথাটি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করতে লাগলেন। এতে আমরা বললাম, হায়! যদি তিনি (সা.) চুপ করে যেতেন" (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ

ইসলাম মানবজাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের সকল রাস্তাকে পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরে মানবজাতিকে খোদার নিকট পৌঁছে দিতে চায়। পবিত্র কুরআন এ সম্পর্কে আমাদেরকে জানাচ্ছে, মূর্তিপূজা ও মিথ্যাচারিতা ও পিতামাতার অবাধ্য হওয়া তিনটি বড় গুনাহ্ মানুষকে খোদা থেকে দূরে সরিয়ে খোদার অসন্তুষ্টির পথে নিয়ে যায় এবং তার আত্মাকে ধ্বংস করে দেয়।

হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, অংশীবাদিতা, পিতামাতার অবাধ্যতা ও মিথ্যাচারিতা মহাপাপ। মিথ্যা মানুষের আত্মাকে কলুষিত ও অপবিত্র করে দেয়।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, বাস্তব কথা হলো এই যে, মানুষ যতক্ষণ না মিথ্যা পরিহার করে ততক্ষণ সে পবিত্র হতে পারে না। দুনিয়ার হীন ব্যক্তি বলতে পারে যে, মিথ্যা ব্যতিরেকে চলা যায় না। এটা এক অযথা কথা।

যদি সত্য দ্বারা চলা সম্ভব না হয় তবে মিথ্যা দ্বারা চলা কখনই সম্ভব নয়। পরিতাপ এই যে, হতভাগা লোকেরা আল্লাহ্‌র সম্মান করে না। তারা জানেনা যে, খোদার আশিষ ছাড়া চলা অসম্ভব।

তারা মিথ্যা ও অপবিত্রতাকে নিজেদের ত্রাতা ও মা'বুদ মনে করে। এজন্য আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে মূর্তির অপবিত্রতার সাথে মিথ্যার অপবিত্রতাকে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে প্রকৃত পবিত্রতা দান করুন এবং সকলকে মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকার শক্তি দান করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ

মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

আমরা এমন স্থায়ী পদস্খলন থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

হে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ! খোদা আপনাদের প্রতি করুনা করুন। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, আমি এমন এক ব্যক্তি যাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জ্ঞান দান করা হয়েছে। আমার প্রভু প্রতিটি সূক্ষ্ম বিষয়কে বুঝা আমার জন্য সহজ করেছেন আর জীবন-যাত্রার সব সমস্যা থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি আমাকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাঁর বিশেষ স্নেহের জন্য আমাকে বেছে নিয়েছেন আর আমাকে আমার আমিত্বের গৃহ থেকে মুক্ত করে সংগোপনে আমাকে তাঁর সুমহান ও বিশাল গৃহ অভিমুখে নিয়ে গেছেন। জল-স্থল পাড়ি দিয়ে যখন আমি প্রকৃত ক্বিবলায় পৌঁছলাম এবং তাঁর মনোনীত গৃহ প্রদক্ষিণ করার সৌভাগ্য লাভ করলাম আর আমার বন্ধু ও মূর্তিমান ভালবাসা, প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র স্নেহের সুদৃষ্টি, অন্তরাত্মার প্রখরতা ও আধ্যাত্মিক রহস্যকে বুঝার ক্ষেত্রে যখন আমাকে বিশেষত্ব প্রদান করল তখন আমি আমার পূর্ণ অস্তিত্বকে তাঁর হাতে সঁপে দিলাম।

আমি তাঁর পক্ষ থেকে সব সূক্ষ্ম বিষয় ও আধ্যাত্মিক রহস্যের জ্ঞান অর্জন করেছি। বিভিন্ন মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষ থেকে আমাকে ব্যুৎপত্তি দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মাঝে বিদ্যমান সব বিবাদের প্রতি আমি আমার মনোযোগ নিবদ্ধ করছি। আমি সব বিতর্কের উৎস ও কারণ সন্ধান করেছি। অনুসন্ধান ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ক্ষেত্র বাদ রাখিনি বরং সুনিশ্চিতভাবে আমি এর মূল খুঁজে বের করেছি। আমি বুঝতে পেরেছি, বিবাদ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মানুষ যে ভুল-ভ্রান্তি করেছে, একটি দিককে উপেক্ষা করে অন্য আরেকটি দিককে অবলম্বন করাই হলো এর মূল কারণ। প্রকৃত জ্ঞান ছাড়াই তারা একটি আঙ্গিককে বড় করে দেখে আর এর বিপরীত মতামতকে তুচ্ছ ও খাটো মনে করে। কাঙ্খিত কোন কিছুর ভালবাসায় মত্ত হলে প্রবৃত্তি এর বিরোধী সব বিষয়কে ভুলে বসে–এই হলো মানবস্বভাবের বৈশিষ্ট্য। তখন সে সহানুভূতিশীলদের সদুপদেশকেও মনোযোগ দিয়ে শুনতে চায় না বরং বেশীর ভাগ সময় তাদের বিরোধিতা করে আর তাদেরকে শত্রু মনে করে। তখন সে তার হৃদয়ের অস্বচ্ছতার কারণে তাদের সান্নিধ্যে যায় না আর তাদের কথাও মন দিয়ে শোনে না।

এ আত্মিক বিপত্তির নানা কারণ ও হেতু রয়েছে আর বিভিন্ন পথ ও পন্থা দিয়ে এ ব্যাধির অনুপ্রবেশ ঘটে। এর সবচেয়ে বড় কারণগুলো হলো, হৃদয়ের কাঠিন্য, পাপা আসক্তি, পরকালে জবাবদিহিতার প্রতি ঔদাসীন্য এবং প্রতারক ও মিথ্যাবাদী শত্রুদের সাথে সখ্যতা। মানব জীবনে অজ্ঞতা বদ্ধমূল হয়ে গেলে হোঁচট খাওয়া তার স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয় আর প্রবৃত্তির দাসত্বই তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পরিণত হয়। অতএব আমরা এমন স্থায়ী পদস্খলন থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। প্রায়শ এসব বদ-অভ্যাসই মানুষকে বিবাদ-বিতন্ডার সময় গভীর হঠকারিতার পথে ঠেলে দেয়। সত্যান্বেষী ও হেদায়াত সন্ধানী একজন মানুষের জন্য কূ-প্রবৃত্তির খাতিরে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়া প্রকৃতপক্ষে জীবননাশী এক বিষ। এ ফাঁদে পতিত মানুষ খুব কমই রক্ষা পায়। কখনও কখনও এসব অসৎ কারণ এবং বিভ্রান্তিকর হেতুগুলো প্রচ্ছন্ন ও দৃষ্টির আড়ালে থাকে।

এসব ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষ তা দেখতে পায় না আর মনে করে, সে সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত কাজ করছে। সে তড়িঘড়ি করে যখন বিতন্ডায় লিপ্ত হয় আর বিবাদ-বিসম্বাদে ক্রমশ: উগ্র হয়ে উঠে, এমন ক্ষেত্রে প্রায়শই একটি তুচ্ছ ধারণা এবং দুর্বল অভিমতকে জোরালো ও অকাট্য প্রমাণ বলে মনে করে, যার ফলে তার চালচলনে অহংকারীর হাবভাব দেখা যায়। এসব কিছুর কারণ হলো, গভীর মনোযোগের অভাব, অন্তর্দৃষ্টিহীনতা, সত্য-জ্ঞানের স্বল্পতা, সামাজিক কদাচারের দাসত্ব, রিপুর পুরোপুরি বশ্যতা স্বীকার, আধ্যাত্মিক রুচিশূন্যতা, উচ্চাকাঙ্খা সম্পর্কে নৈরাশ্য এবং জড় জগতের প্রতি পূর্ণ আসক্তি এবং এর অন্ধ অনুসরণ-অনুকরণ।

['সির্‌রুল খিলাফাহ্‌' পুস্তক, বাংলা সংস্করণ পৃষ্ঠা-১৩-১৪]

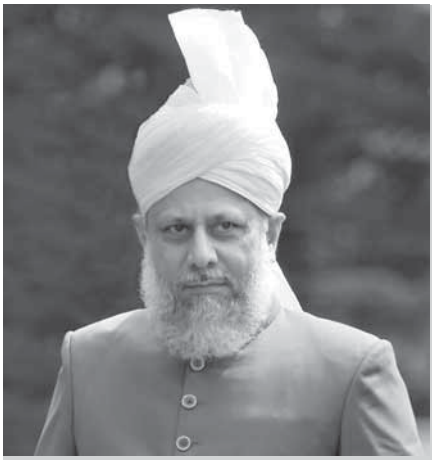

কয়েকদিন পূর্বে ইন্দোনেশিয়াতে আহমদীয়া বিরোধীরা নির্মম ও নৃশংশভাবে যে তিনজন আহমদীকে শহীদ করেছে সেজন্য সব আহমদীর হৃদয়ই দুঃখ ভারাক্রান্ত।

কিন্তু আহমদীয়া জামা'ত এবং সকল আহমদী সর্বদা একজন কর্তব্যপরপায়ণ বিশ্বাসীর ন্যায় আল্লাহ্ তাআলার আদেশ পালন করে, অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থেকে নিজ প্রান, সম্পদ এবং সর্ব প্রকার ক্ষয়-ক্ষতিতে ধৈর্যধারণ করে এবং বলে,'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন' অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাব।

আল্লাহ্ তাআলা বিশ্বাসীদের এ চিহ্নই বর্ননা করেছেন।

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ১১ ফেব্রুয়ারী, ২০১১-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবা

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بسْم الله الرَّحْمَن الرَّحيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ * الرَّحْمَن الرَّحيم * مَالك يَوْم الدِّين * إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صرَاطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ آمين

তাশাহুদ, তাউজ, তাসমিয়া ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) নিম্ন বর্ণিত আয়াত সমূহ পাঠ করেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٤﴾

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٥﴾

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٦﴾

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٧﴾

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

(সূরা বাকারা ঃ ১৫৪-১৫৮)

এ আয়াত সমূহের অনুবাদ হচ্ছে, হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তোমরা তাদের মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা (তা) উপলব্ধি করতে পারছ না। আর আমরা কিছুটা ভয়ভীতি ও ক্ষুধা এবং কিছুটা ধনসম্পদ, প্রাণ ও ফলফলাদীর ক্ষতির মাধ্যমে অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করবো। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও, যারা তাদের উপর বিপদ এলে বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাবো। এদের জন্যই রয়েছে এদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অনেক আশীষ ও কৃপা। আর এরাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।

কয়েকদিন পূর্বে ইন্দোনেশিয়াতে আহমদীয়া বিরোধীরা নির্মম ও নৃশংশভাবে যে তিনজন আহমদীকে শহীদ করেছে সেজন্য সব আহমদীর হৃদয়ই দুঃখ ভারাক্রান্ত। কিন্তু আহমদীয়া জামা'ত এবং সকল আহমদী সর্বদা একজন কর্তব্যপরপায়ণ বিশ্বাসীর ন্যায় আল্লাহ্ তাআলার আদেশ পালন করে, অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থেকে নিজ প্রান, সম্পদ এবং সর্ব প্রকার ক্ষয়-ক্ষতিতে ধৈর্যধারণ করে এবং বলে,'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন' অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাব। আল্লাহ্ তাআলা বিশ্বাসীদের এ চিহ্নই বর্ননা করেছেন।

আমি যে আয়াত পাঠ করেছি এটি আহমদীগণ ছাড়া আর কে অধিক বুঝতে পারবে? শত্রুরা বার বার আমাদের সাথে এ আচরণ করে আর

আমরা বার বার এ আয়াত আমাদের সামনে রেখে পুণরাবৃত্তি করতে থাকি। প্রাণ ও সম্পদের কুরবানী তা ইন্দোনেশিয়ার আহমদীরাই দিক বা পাকিস্তানের আহমদীরা বা অন্য কোন দেশের আহমদীরা, মু'মিন সুলভ আচরণ করার যে অনুপ্রেরণা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিক একজন অহমদীর অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন তা সব স্থানের আহমদীদের মাঝে সমান ভাবে বিদ্যমান। খোদা তাআলার খাতিরে আমাদের যে ক্ষতি করা হচ্ছে এবং আমাদের যে কুরবানী দিতে হচ্ছে, এক্ষেত্রে তিনি (আ.) এ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করার আদেশ দিয়েছেন এবং এর বাস্তব নমুনা আমাদের প্রিয় নেতা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) প্রদান করেছিলেন। তিনি তাঁর সাহাবাদের (রা.) মাঝে এ অনুপ্রেরনা সৃষ্টি করেছিলেন যারা এর বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন। বরং সত্যের শত্রুরা প্রত্যেক নবীর মান্যকারীদের যখন জীবন অতিষ্ট করেছিল, সব যুগের ফিরাউনরা যখন ঈমান আনয়নকারীদেরকে 'হয় বিশ্বাস ত্যাগ কর নতুবা প্রান দিতে হবে' এ দুটির মধ্য থেকে যে কোন একটি বেছে নেয়ার শর্ত রাখে তখন ঈমান আনয়নকারীরা তাদের ঈমানের দৃঢ়তারই পরিচয় দিয়ে থাকেন।

যেমন হযরত মূসা (আ.)-এর সময় যাদুকরদের কাছে যখন এটি পরিস্কার হয়ে গেল যে আমাদের যাদুর বিপরীতে হযরত মূসা (আ.) যা উপস্থাপন করেছেন তা পার্থিব যাদু নয় বরং আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য, এটি এমন এক নিদর্শন যার সাথে পার্থিক কৌশল সমূহের তুলনা চলে না। যখন তাদের কাছে এ সত্য পরিস্কার হল যে হযরত মূসা (আ.) যে বাণী শোনাচ্ছেন তা ঐশী বাণী, তখন সাথে সাথে তারা তার প্রতি ঈমান আনে। এতে ফেরাউনের অহংকারে খুব আঘাত লাগে। সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বলে, তোমাদের এ আচরনের জন্য আমি তোমাদের এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেব যা সবাই সর্বদা স্মরণ রাখবে।

তখন ঈমান আনয়নকারীরা ফিরাউনকে এ জবাব দিয়েছিল, আমরা তোমাকে খোদা তাআলার নিদর্শনের উপর প্রাধান্য দিতে পারি না, খোদা তাআলার প্রতি ঈমান আনার উপর প্রাধান্য দিতে পারি না। তারা বলেছিল,'ফাকযে মা আনতা কাযিন, ইন্নামা তাকযে হাযিহিল হায়াতিদ্ দুনিয়া' অর্থাৎ আমাদের ঈমান থেকে বিচ্যুত করার জন্য তুমি যত পার বল প্রয়োগ কর, তুমিতো শুধু আমাদের এ পার্থিব জীবনকেই শেষ করতে পার। কিন্তু ঈমান আনার পর আল্লাহ্ তাআলার জন্য উৎসর্গীত হয়ে আমরা যা লাভ করব তা অনেক উত্তম, যা তোমার বাদশাহী কল্পনাও করতে পারবে না।

অতএব মূসা (আ.)-এর মান্যকারীরা যদি এমন ঈমান প্রদর্শন করতে পারে, আমরা যারা সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল এবং খা'তামুল আম্বিয়ার মান্যকারী যার উপর পরিপূর্ণ শরিয়ত অবতীর্ন হয়েছে, যার উপর আমল করে আমরা ঈমানের চূড়ান্ত মার্গে পৌছাতে পারি, আবার রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আগমনকারী মসীহ ও মাহদীরও মান্যকারী যিনি সপ্তর্ষি মন্ডল থেকে ঈমান নামিয়ে এনে ক্রমাগত নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে আমাদের ঈমান দৃঢ় করেছেন, আমরা কি আজ ফিরাউন বা ফিরাউনের চেলাদের ভয়ে আমাদের ঈমান নষ্ট করব? যখন খোদা তাআলা আমাদের 'বাশ্বিরিস্ সাবিরীন' অর্থাৎ 'তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও' বলে সুখবর দিচ্ছেন এবং ধৈর্য প্রদর্শন ও প্রাণের কুরবানীর বিনিময়ে আমাদেরকে চির জীবনের সুসংবাদ দিচ্ছেন। অতএব যারা ঈমানের এ স্তরে পৌছেছে কোন হুমকি ধমকি তাদেরকে তাদের সৎ উদ্দেশ্য থেকে হটাতে পারবে না।

চরম জুলুম নির্যাতনও তাদেরকে তাদের ঈমানে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকতে বাঁধা হতে পারবে না। হে আহমদীয়াতের শত্রুগণ! পৃথিবীর যে প্রান্তেই বসবাসকারী হও, আহমদীদের উপর যত অত্যাচার করতে চাও কর, (আহমদীদের উপর) জুলুম-নির্যাতন বৈধ করতে চাও কর, কিন্তু আমাদেরকে আমাদের ঈমান থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। সব স্থানের আহমদীদের কাছ থেকে তোমরা এ জবাবই শুনতে পাবে 'ফাকযে মা আনতা কাযিন' অর্থাৎ তোমার যা পার কর, আমাদেরকে আমাদের ঈমান থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ তাআলা।

ইন্দোনেশিয়ার আহমদীরাও শত্রুদের এ জবাবই দিয়েছে। শুরুতে বিভিন্ন সময়ে তাদের হুমকি দেয়া হচ্ছিল। কিন্তু ঈমানী শক্তিতে ভরপুর এসব লোকেরা এসব হুমকির বিন্দু মাত্র পরোয়া করেনি। যেখানে এ ঘটনা ঘটেছে সেটি একটি ছোট জামা'ত। নারী ও শিশু সহ সর্বমোট ত্রিশ জনের জামা'ত, শুধু সাতটি পরিবার । কিন্তু তারা শত্রুদের এ কথার সামনে নতজানু হয়নি যে জামা'ত থেকে পৃথক হওয়ার ঘোষণা দাও এবং এসব নামধারী মোল্লাদের পিছনে চল।

সেখানে মোল্লা বা তাদের শিষ্যদের সবচেয়ে বড় দাবী ছিল, তোমাদের মোয়াল্লেমকে এখান থেকে বের কর। অথচ সেই মোয়াল্লেম বহিরাগত কেউ ছিল না, বরং ঐ এলাকারই অধিবাসী ছিল। যাইহোক, বিরোধীতা যখন সীমা ছাড়িয়ে যেতে লাগল তখন নিকটবর্তী জামা'তসমূহের বিশ জন খোদ্দাম বিভিন্ন সময়ে ডিউটি দেয়ার জন্য সেখানে আসত। তারা সেখানকার মিশন হাউসে এসে বসত যাতে বিরোধীরা মিশন হাউস দখল করতে না পারে। কেননা তারা (বিরোধীরা) পুলিশের প্রশ্রয় ও সহযোগীতা পায়। আমাদের সাথে সর্বদা এমন আচরনই হয়ে থাকে। প্রশাসনের বা লোকদের কারণে যখন আমরা আমাদের কোন ঘর বা মিশন হাউস বা মসজিদ খালি করে দিয়েছি তখনই প্রশাসন সেখানে তালা লাগিয়ে দিয়েছে নতুবা প্রশাসন লোকদের তা দখল করতে দিয়ে দিয়েছে। আর বিরোধীরা দখল করে নিলে প্রশাসন তাদের সেখান থেকে বের করে তা খালি করে দেয় না।

গত কয়েক বছর যাবৎ আমাদের এ অভিজ্ঞতা হয়েছে। এজন্য এসব অভিজ্ঞতার পর এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, যত বাধা বিঘ্নই আসুক কোন অবস্থাতেই আমরা আমাদের কোন জায়গা খালি করব না। মিশন হাউসের ভেতরে আমাদের লোকেরা বসে ছিল। এ যালেমরা ভেতরে ঢুকে কাঁচি, কাঠ খন্ড, চাকু, লাঠি প্রভৃতি দ্বারা আমাদের লোকদের উপর হামলা চালিয়ে আহত করে টেনে হিঁচড়ে বাইরে বের করে নিয়ে আসে। অথচ পুলিশ বাইরে দাঁড়িয়ে এসব কিছু দেখছিল। তারা তিন জন আহমদীকে শহীদ করে এবং পাঁচ জনকে আহত করে।

জামা'তের সবাই এ সংবাদ পেয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার ফযলে জামা'তের সদস্যদের ঈমান পূর্বের ন্যায় দৃঢ়ই আছে, বরং অধিক দৃঢ় আছে। চূড়ান্ত বর্বরতার সাথে এসব

করা হয়েছে। অজ্ঞ যুগের কাফেরদের ন্যায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে। এটি খুবই দুঃখজনক যে এসব নামধারী যালেম মুসলমানরা পূর্বের ন্যায় সেই রাহমাতুল্লিল আলামীনের (সা.) নামেই এসব ঘটিয়েছে যিনি রহমত বন্টন করতে এসেছিলেন।

যে মহান নবী যুদ্ধের সময়ও কিছু নীতি নির্ধারণ করেছিলেন এবং সেগুলো পালনের শক্ত আদেশ দিয়েছিলেন। যিনি যুদ্ধপরাধী নিহত শত্রুদের সম্পর্কেও এ আদেশ দিয়েছিলেন যে তাদের মুসলা (অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে লাশ বিকৃত) করবে না, অথচ এটি আরবের প্রচলিত রীতি ছিল। কেননা কোন ভাবেই লাশের অসম্মান করা সমীচিন নয়। ধর্মের কথা থাক, এটি মানবিক মূল্যবোধেরও পরিপন্থী। কিন্তু আমাদের আহমদীদের উপর হামলাকারী যালেমরা এমন নৃসংশ ভাবে লাশের অবমাননা করে যে লাশগুলো চেনা যাচ্ছিল না। প্রথমে যে রিপোর্ট এসেছিল তাতে ভুলক্রমে অন্য লোকদের নাম এসেছিল। এরপর পুণরায় পর্যবেক্ষণ করে জানা যায় এরা অন্য লোক। তাদের আত্মীয় স্বজনরা এসে বিভিন্ন চিহ্নাবলী দেখে তাদের লাশ সনাক্ত করে।

এরা লাশের অবমাননা করায় কাফেরদেরও ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের প্রিয়জনদের শহীদ করা হয়েছে এবং তাদের লাশের যে অবমাননা করা হয়েছে, এতে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত এবং দুঃখভারাক্রান্ত। কিন্তু সবচেয়ে বড় যে যুলুম তারা করেছে, তা হচ্ছে তারা এসব আমাদের প্রিয় ও মওলা এবং মানবতার পথপ্রদর্শক এবং রাহমাতুল্লিল আলামীন (সা.)-এর নামে করেছে।

এমন নিষ্ঠুর ভাবে এটি করা হয়েছে যে দেশের সংবাদ মাধ্যমগুলোও এ সংবাদ পরিবেশন করেছে। দেশের ও দেশের বাইরের সংবাদ মাধ্যমগুলো এর ভিডিও চিত্র দেখাতে এজন্য অপারগতা দেখিয়েছে যে মানবতা বিবর্জিত এ দৃশ্য দেখানো সম্ভব নয়। আল জাযিরা চ্যানেল যেটি সাধারণত এ ধরনের সংবাদের ভিডিও চিত্র প্রচার করে থাকে, তারাও এ বর্বরতার কাছে হার মেনেছে। আল জাযিরা তাদের সংবাদে বলেছে, এটি খুব ভয়ানক ও মর্মান্তিক দৃশ্য ছিল। পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় বিরোধীদের একটি মিছিল আহমদীদের ঘরে ঢুকে আক্রমণ চালায়।

এরপর তারা নির্মম হত্যাকান্ড শুরু করে এবং তিন ব্যাক্তিকে উলঙ্গ করে পাথর, লাঠি, চাকু ও বর্ষা দ্বারা আঘাত করে হত্যা করে। তারা বলে, এর যে ভিডিও ফুটেজ বানানো হয়েছে এবং যেসব ছবি তোলা হয়েছে তা সম্প্রচার করা সম্ভব নয়।

এশিয়ান মানবাধিকার সংস্থা বলেছে, আহমদীদের বিরুদ্ধে যে নির্মম অত্যাচার চালানো হয়েছে, ইন্দোনেশিয়ান ওলামা কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থানীয় জনসাধারণ এটিকে বৈধ মনে করে। স্থানীয় জনসাধারণ বলতে হামলাকারীদের বোঝানো হয়েছে। এ হচ্ছে বর্তমানের আলেমগনের অবস্থা যারা ইসলামের নামে হাজার বছর পূর্বের অজ্ঞতা ও যুলুম-নির্যাতন মূলক কাজ করার জন্য মুসলমানদের উস্কানি দিচ্ছে। 'দি ইকোনোমিষ্ট' নামে একটি পত্রিকা লিখেছে, মুসলমান ও খৃষ্টানদের বিরোধের কারনে এ জুলুম হয়নি, বরং মুসলমান নামধারীরা মুসলমানদের সাথে এ আচরণ করেছে।

এ বর্বর কর্মকান্ডের চিত্র যদি কারো দেখার শক্তি থাকে তবে দেখতে পারে, এ নিষ্ঠুর হত্যাকান্ড ও পাশবিকতা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির যা বর্তমান যুগের শিক্ষিত ও সভ্য দুনিয়া থেকে বহু দূরের। আরো লিখেছে, এ ঘটনাটি অন্যান্য শহরবাসীদেরও হতভম্ব করেছে। আমাদের অনেক আহমদীরাও এর ভিডিও চিত্র দেখেছে, যারাই দেখেছে তারা আমাকে লিখেছে, আমরা এক আধ মিনিটের বেশী এটি সহ্য করতে পারিনি।

এক মহিলা লিখেছে, আমি বাচ্চাদের কাছ থেকে লুকিয়ে এটি দেখার পর কাঁদতে শুরু করেছি, বাচ্চারা অবাক হচ্ছিল যে কেন আমি কাঁদছি? আমাদের মা কেন কাঁদছে? অনুরূপভাবে আলজেরিয়ার অধিবাসী একজন আহমদী আমার নিকট এসেছেন এবং এ ঘটনা উল্লেখ করতেই হু হু করে কাঁদতে থাকেন। এমন ভয়ানক দৃশ্য যে কোন ব্যক্তি সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু তারা তাদের বাচ্চাদের হৃদয়ও এত কঠিন করে ফেলেছে যে তারা সেখানে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখে তালি বাজাচ্ছিল। নিউ ইয়র্ক টাইমস্, ফাইনান্সিয়াল টাইমস্ এরা সবাই প্রায় এধরনের সংবাদই লিখেছে।

তাদের সংবাদপত্র জাকার্তা পোষ্টে এক প্রাবন্ধিক তার প্রবন্ধে লিখেছে, আহমদীয়া জামা'তের সদস্যদের উপর সাম্প্রতিক যে হামলা হয়েছে, তা যে কারনেই হয়ে থাকুক, এটি প্রকাশ করে যে আমাদের সমাজে সংখ্যালঘু দলগুলোর জন্য কোন সভ্যযুগীয় আবেগানুভূতি ও সহনশীলতা নেই। অথচ এ আহমদীরা এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী দলগুলো দেশ গঠনে সমান ভাবে অংশীদার। ইন্দোনেশিয়া গঠনে সমান অংশীদার। আরো লিখেছেন, এ দুঃখজনক ঘটনা ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসে চিরকালের জন্য অমোচনীয় অংশ হয়ে গেল। আরো লিখেছে, যারা বলে আহমদীয়া জামা'তের শিক্ষা অনৈসলামিক, এজন্য তাদের বাঁচার অধিকার নেই, এরা সবাই পথভ্রষ্ট বা তাদের পথভ্রষ্ট করা হয়েছে। আরো লিখেছে, বিংশ শতাব্দীর নতুন চিন্তাধারা এবং আধুনিক ধারনা বিজ্ঞ আহমদীরাই ইন্দোনেশিয়াকে দিয়েছে। আমাদের নেতৃবৃন্দ আহমদীয়া জামা'তের পন্ডিতদের কুরআনের অনুবাদ পাঠ করেন, যাদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী সুকার্নও অন্তর্ভূক্ত। কুরআনের এ অনুবাদ তারা সহজে বুঝেছেন এবং এটি পাঠ করে তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে।

অতঃপর লিখেছে, নিঃসন্দেহে আমরা এ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে কৃতজ্ঞ। আহমদীয়া জামা'ত এ দেশের অমূল্য সেবা প্রদান করেছে। এই হচ্ছে এ প্রবন্ধের সারাংশ যা আমি বর্ননা করলাম। ইয়োগো জাকার্তার ইসলামী ইউনিভার্সিটির একজন প্রভাষক এটি লিখেছেন। জাকার্তা পোষ্ট, জাকার্তা গ্লোব প্রভৃতি পত্রিকা এ ঘটনা সম্পর্কে এ সংবাদ প্রকাশ করেছে এবং খুব দৃঢ় ভাবে এ কর্মকান্ডের নিন্দা জানিয়েছে এবং প্রসাশনের দৃষ্টি আকর্ষন করেছে। সেখানকার সংবাদ মাধ্যম ও শিক্ষিত সুশীল সমাজের মধ্যে কমপক্ষে এ সাহস আছে যে তারা নির্যাতনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে।

অন্তত এমন কিছু লোক সেখানে আছে যাদের কাছ থেকে জাতির মঙ্গলের আশা করা যেতে পারে। হায়! পাকিস্তানের শিক্ষিত সুশীল সমাজ এবং সংবাদ মাধ্যমগুলোর মধ্যেও যেন এ সাহস সৃষ্টি হয়।

আহমদীয়া জামা'তের বিরোধীতা

ইন্দোনেশিয়াতে নতুন নয়। চিরকাল ঐশী জামা'তের সাথে শয়তানী শক্তির যে আচরণ চলে আসছে, শয়তান যে আচরণ করে আসছে, অনুরুপভাবে কোন না কোন ভাবে আহমদীয়া জামা'তেরও বিরোধীতা হয়ে চলেছে, বিশেষ ভাবে ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে। ইন্দোনেশিয়াতে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই এ বিরোধীতা হচ্ছে।

সর্বদাই মোল্লারা লোকদের সৎ পথ থেকে বিভ্রান্ত করছে। ইন্দোনেশিয়াতে তারা সব সময়ই জামা'তের বিরোধীতা করেছে। মোল্লাদের কাজই এটি, সে যে দেশের মোল্লাই হোক, তারা সত্য মানবে না। কেননা এতে তাদের স্বার্থ জড়িত। তারা মনে করে সত্য মেনে নিলে তাদের আয় উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। তাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা শেষ হয়ে যাবে। তাদের জ্ঞানের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ হয়ে যাবে।

আজ আমি ইন্দোনেশিয়া জামা'তের সূচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং তাদের উপর নির্যাতনের সংক্ষিপ্ত বিবরন তুলে ধরব। এরপর শহীদদের সম্পর্কে বলব। ইন্দোনেশিয়াতে ইসলামের পুনর্জাগরনের সূচনা এবং আহমদীয়াত বিস্তার ঐশী পরিকল্পনা অনুযায়ী আশ্চর্য্যজনক ভাবে হয়েছে। এ দেশের জন্য সম্মান ও গৌরবের বিষয় যে সেখানের চার জন ব্যাক্তি নিজেরাই আহমদীয়া জামা'তের কেন্দ্র কাদিয়ানে গিয়ে আহমদীয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

কোন মোবাল্লেগ গিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় জামা'ত প্রতিষ্ঠিত করেনি, বরং চার ব্যাক্তি নিজেই কাদিয়ান এসেছে। তারা আহমদীয়াত গ্রহণের লক্ষ্যে কাদিয়ান আসে নি। বরং (বিভিন্ন স্থান) ঘুরতে ঘুরতে এসেছে। এর বিবরণ এরূপ, ১৯২৩ সনে সুমাত্রার চার যুবক মোহতরম আবু বকর আইয়্যুব সাহেব, মৌলভী আহমদ নুরুদ্দীন সাহেব, মৌলভী যেয়নী যাহলান সাহেব এবং হাজী মাহমুদ সাহেব ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য সুমাত্রা থেকে হিন্দুস্তান আসেন।

খোদার ইচ্ছায় কোলকাতা, লক্ষ্ণৌ এবং লাহোর ভ্রমণের পর তারা কাদিয়ান আসেন। এ চারজন যুবক আগষ্ট ১৯২৩ এ কাদিয়ানে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আবেদন জানান, আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করুন। হুযূর (রা.) তাদের আবেদন মঞ্জুর করে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। শিক্ষার্জনের সময়ই তারা আহমদীয়াতের সত্যতা বুঝতে পেরে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন।

এরপর কাদিয়ানে বয়আত গ্রহণকারী ইন্দোনেশিয়ান যুবকগণ বয়আতের পর শিঘ্র আহমদীয়াতের আলো দ্বারা তাদের দেশ আলোকিত করার চেষ্টা করেন। কাদিয়ানে বসে বসেই তারা তাদের আত্মীয় স্বজনদের তবলিগী চিঠিপত্র লেখা শুরু করে দেয়। এভাবে ইন্দোনেশিয়াতে তবলীগের পথ সহজ হতে থাকে। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) ইউরোপ সফর করে যখন ফেরত আসেন তখন হুযূরের সম্মানে একটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ আমন্ত্রনে ইন্দোনেশিয়ার ঐ যুবক ছাত্রগণ হুযূরের কাছে আবেদন জানান, হুযূর! পূর্বের দ্বীপসমূহের প্রতিও একটু দৃষ্টি দিন। তখন হুযূর প্রতিশ্রুতি দেন, ইনশাআল্লাহ আমি নিজে যাব অথবা আমার কোন প্রতিনিধি আপনাদের দেশে যাবে।

এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) এ কাজের জন্য হযরত মৌলভী রহমত আলী সাহেবকে নির্বাচন করেন এবং তাকে সেখানে প্রেরণ করেন। তিনি সমুদ্র পথে সফর করে সেপ্টেম্বর, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে এ দেশে পৌঁছেন এবং সর্ব প্রথম সুমাত্রায় আচিয়া অঞ্চলের একটি ছোট জনপদ তাপাতুআনে অবস্থান গ্রহণ করেন। সেখানকার সমাজ ও রীতি নীতি ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। ভাষাও ছিল ভিন্ন, লোকজনও ছিল ভিন্ন, কেউ তার পরিচিতও ছিল না।

কিন্তু প্রারম্ভিক পর্যায়ের এসব সমস্যাবলী হযরত মৌলভী সাহেবের উদ্দিপনা ও সংকল্পে কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারল না। সে দেশের ভাষা শেখার সাথে সাথে তিনি ব্যাক্তিগতভাবেও তবলীগ আরম্ভ করলেন। এরপর মৌলভীদের সাথে আলোচনা ও বিতর্কও শুরু হল।

হযরত মৌলভী সাহেবকে আল্লাহ্ তাআলা নিজ সাহায্য সহায়তা দ্বারাও ভূষিত করেছেন। কয়েক মাসেই খোদা তাআলার ফযলে ইন্দোনেশিয়ার প্রথম জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে আটজন ব্যাক্তি বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। এরপর ধীরে ধীরে আরো অনেক বয়আত হতে থাকে। এটির বিবরণ খুব দীর্ঘ। শুরুতে হযরত মৌলভী সাহেবকে অনেক বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়। ভাষা ভিন্ন হবার সমস্যা ছিল। সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভিন্ন ছিল।

রীতি নীতি, চাল চলন সবই ছিল ভিন্ন। এরপর বিরোধীতাও শুরু হয়ে গেল। যাই হোক, যেভাবে আমি বর্ননা করে এসেছি, মৌলভী সাহেব এসব বাঁধা জয় করেন। মৌলভীরা সেখানে ফতোয়া দিল, আহমদীদের বই পুস্তক এবং প্রবন্ধ সমূহ পড়া যাবে না এবং তাদের বক্তৃতা শোনা যাবে না। স্থানীয় আহমদীদের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন সেখানের লোকেরা স্থানীয় আহমদীদের বয়কট (এক ঘরে) করতে শুরু করে। এমনকি সংবাদ পত্রগুলোও কোন সংবাদ প্রকাশ করতে চাইতো না। (আহমদীদের বিষয়ে) কেউ কোন প্রবন্ধ ছাপাতে রাজী হতো না। বিরোধীতা এত বেশী বেড়ে যায় যে মৌলভী সাহেবের বাড়ীর সামনে তিন সহস্রাধিক লোক একত্রে দাড়িয়ে চিৎকার ও হৈ হুল্লোড় করত এবং হৃদয় বিদারক বিভিন্ন ধরনের শ্লোগান লাগাত এবং গালমন্দ করত।

এরপর হাজী মাহমুদ সাহেবও সেখানে এসে পড়লেন। মৌলভীরা জোড়পূর্বক তার কাছ থেকে এ বিবৃতি লিখিয়ে নিল যে আমি আহমদীয়াত ত্যাগ করছি এবং তারা এবিষয়ে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করল এবং ভীষন হৈচৈ শুরু হল। এরপর আরো তীব্র ভাবে মৌলভী সাহেবের বিরোধীতা আরম্ভ হল। কিন্তু পরবর্তীতে হাজী মাহমুদ সাহেব ধাতস্থ হন এবং আলেমদের কৌশল থেকে নিরাপদ থাকেন। আল্লাহ্ তাআলা তাকে রক্ষা করেন।

আলেমরা যখন জানতে পারল যে তাদের ষড়যন্ত্র ব্যার্থ হয়েছে, তখন তারা ঐক্যবদ্ধভাবে হযরত মৌলভী রহমত আলী সাহেবকে দেশ থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টা আরম্ভ করে এবং এজন্য তারা সরকারের লোকজন এবং প্রতিনিধিদের কাছেও যায়। কিন্তু প্রশাসন তাদের বলে দেয় ধর্মীয় বিষয়ে

আমরা হস্তক্ষেপ করব না। যাই হোক, বিরোধীতা চলতেই থাকে। ডিসেম্বর, ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে পাডাঙ্গ অঞ্চলে অআহমদী আলেমদের সাথে একটি বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় যাতে বড় বড় ওলামা মাশায়েখগণ এবং সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

এ বিতর্ক অনুষ্ঠানে চিরন্তন নিয়মে আহমদীয়া জামা'তের মোবাল্লেগ বিজয় লাভ করেন এবং বিরোধী আলেমগণকে পরাজয় বরন করতে হয়। এর ফলে আহমদীয়াত প্রচারের পথ সহজ হয়ে যায়। ইতোমধ্যে ইন্দোনেশিয়ার ডুকু অঞ্চলে তৃতীয় জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে হযরত মৌলভী রহমত আলী সাহেব কাদিয়ান ফেরত আসেন। এরপর ১৯৩০ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) পুণরায় তাকে সুমাত্রায় যেতে বলেন। হযরত মৌলভী সাহেব হুযূরের কাছে তার সহযোগী হিসেবে আরো একজন মুবাল্লেগ পাঠানোর জন্য আবেদন জানান। হুযূর সেই আবেদন গ্রহণ করে মোহতরম মৌলভী মোহাম্মদ সাদেক সাহেবকে তার সাথে ইন্দোনেশিয়া যাওয়ার জন্য বলেন। এরপর তারা দু'জন ইন্দোনেশিয়া যান।

(তা'রীখে আহমদীয়াত, ৪র্থ খন্ড, পৃ-৫৩৯)

আহমদীয়াত বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে ইন্দোনেশিয়াতে বিরোধীতাও বাড়তে থাকে। প্রথমে তিনটি জামা'তকে বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয়। তাপুক তুআন জামা'তের উপর সেখানকার রাজার পক্ষ থেকে পরীক্ষা আসে। সেখানের আহমদীদের নিয়মিত নামায আদায়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। (সেখানের স্থানীয় রাজা এ বিধি-নিষেধ আরোপ করে)।

জুমুআর নামায আদায়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় এবং সাধারন প্রচার নিষেধ করা হয়। তাদের উপর এসব প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। 'লহুসুকন' জামা'তের উপরও সেখানের রাজা ভয়ানক নির্যাতন শুরু করে। সে আহমদীদেরকে বলে, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে (নাউযুবিল্লাহ্) মিথ্যাবাদী ও দাজ্জাল বল, নয়তো তোমাদের সবাইকে এখান থেকে বের করে দেয়া হবে। একজন আহমদী মোকাররম গ্রো আলী সাহেবকে তার চাকুরী থেকে বহিস্কার করা হয়। তনকু আব্দুল জলীল এবং তার ছোট ভাইকে আহমদী হবার কারনে গ্রাম থেকে বের করে দেয়া হয়। মৌলভী আবু বকর আইয়্যুব সাহেবও ইতোমধ্যে পড়াশুনা শেষ করে সেখানে চলে এসেছিলেন। তিনি ফারান অঞ্চলে প্রচার কাজ চালাচ্ছিলেন, তখন তার প্রচারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। একদিন রাত বারটার পর শহরের এক পুলিশ কর্মকর্তা সেখানের রাজার আদেশে পুলিশ বাহিনী নিয়ে তাকে গ্রেফতার করতে আসে।

পুলিশ কর্মকর্তা সেখানে উপস্থিত সবার নাম নোট করে নেয় এবং বলে আপনি এবং আপনার সাথী সকালে জেলা প্রধান সাহেবের কার্যালয়ে উপস্থিত থাকবেন। সকালে মৌলভী সাহেব ও তার সাথীরা যখন উল্লেখিত কার্যালয়ে পৌঁছেন তখন তাকে ক্রমাগত প্রশ্নবানে বিদ্ধ করা হয়।

জেলা প্রধান সাহেব প্রশ্ন করে তাকে গ্রেফতার করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার অশেষ কৃপায় মৌলভী সাহেব অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে সব প্রশ্নের জবাব দিতে থাকেন। সেখানে কর্তব্যরত চীফ জাষ্টিস অফিসারের উপর এর সুপ্রভাব পড়ে। তখন তার বিচারক সুলভ চেহারা দূর হতে থাকে এবং তিনি আগ্রহ ও উৎসাহের সাথে আধ ঘন্টা যাবৎ আহমদীয়াত সম্পর্কে জানতে থাকেন। পরে খুব সম্মানের সাথে তাদের সবাইকে মুক্তি দেন।

পূর্বে যেভাবে বলেছি, ইন্দোনেশিয়ান প্রাবন্ধিক ইন্দোনেশিয়া গঠনে জামাতে আহমদীয়ার অবদানের কথা বলেছিল। এখন এর সংক্ষিপ্ত বর্ননা দিচ্ছি। সেখানে কিভাবে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রারম্ভে যেসব বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে তা পূর্বে বর্ননা করেছি। এখানে সব সময়ই বিরোধীতা হয়েছে। যাই হোক, সে দেশের জন্য জামা'ত কি অবদান রেখেছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ননা দিচ্ছি। এ উপমহাদেশে পাক-ভারত থেকে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণার পক্ষে উঁচু আওয়াজ তোলেন এবং অন্য মুসলমানদেরও ঘোষণা দিয়ে বলেন তারা যেন ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানদের স্বাধীনতার জন্য জোরালো ভাবে সাহায্য করে। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী ১৬ই আগষ্ট ১৯৪৬ ইং সনে এক জুমুআর খুতবায় এটি ঘোষণা করেন। হুযূরের এ ঘোষণার পর কাদিয়ানের কেন্দ্রীয় প্রেস ছাড়াও সমগ্র পৃথিবীর আহমদী মিশন সমূহেও ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার পক্ষে জোরালো আওয়াজ তুলতে বলা হয়। অবশেষে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা লাভ করল।

এর বিবরণ পেশ করছি। জাপানী সরকারের বিলুপ্তির পর ডাক্তার সুকর্ন ১৭ই আগষ্ট ১৯৪৫ইং সনে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ডাচ সরকারের বিরুদ্ধে সারা দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। আহমদী মোবাল্লেগ এবং অন্যান্য আহমদীরা তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর ঘোষণা অনুযায়ী স্বাধীনতার ডাকে পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করেন। অহমদী মোবাল্লেগ এবং জামা'তের সদস্যগণ রিপাবলিকান সরকারের সাথে মিলে কাজ করে।

সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ সাহেব (তিনিও মোবাল্লেগ ছিলেন) 'যোগ জাকার্তা' পৌঁছে ডাক্তার সুকর্নর সাথে সাক্ষাত করেন এবং তার কাছে আবেদন জানান যে আমি এ স্বাধীনতার ডাকে অংশ নিয়ে এ দেশের সেবা করতে চাই। অন্যান্য কাজ ছাড়াও রেডিওতে উর্দু ভাষায় সংবাদ প্রচারের দায়িত্ব সুকর্ন তার উপর ন্যাস্ত করেন।

তিনি ছাড়াও মোকাররম মৌলভী আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব এবং মুকাররম মালেক আযীয আহমদ খান সাহেবও প্রায় দু-তিন মাস রেডিওতে সম্প্রচারের কাজ করেন। সৈয়দ শাহ সাহেব এত উৎসাহ উদ্দিপনার সাথে এ স্বাধীনতার ডাকে অংশগ্রহণ করেন যে ইন্দোনেশিয়ার এক প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছিলেন,"আমরা সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ সাহেবকে হিন্দুস্তানী নয়, বরং আমাদের স্বজাতিরই একজন মনে করি।"

শাহ মোহাম্মদ সাহেবের অবদানের এভাবে স্বিকৃতি দেয়া হয়েছে যে, সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ সাহেব ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার ডাকে যে অবদান রাখেন এবং যে সেবা প্রদান করেন, সে প্রেক্ষিতে ৩রা আগষ্ট ১৯৫৭ইং সনে ইন্দোনেশিয়া চিঠির মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা সনদ প্রদান করে। এ সনদ তথ্য মন্ত্রনালয়ের জেনারেল সেক্রেটারীর মাধ্যমে দেয়া হয়।

এতে ঘোষণা করা হয়, জাকার্তার স্থানীয় আহমদীয়া মুসলিম মিশন প্রধান সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ সাহেব, ইন্দোনেশিয়ান জাতি এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যে সেবা এবং অবদান রেখেছেন সেজন্য আমরা একান্ত ভাবে তার প্রতি মর্যাদা ও সম্মান প্রকাশ করছি।

তথ্য মন্ত্রনালয়ের অধীনে পাবলিসিটি বিভাগের কর্মকর্তা রূপে তিনি সর্বদা তার বুদ্ধিমত্তা এবং অন্যান্য গুণাবলীর মাধ্যমে দৃঢ় প্রত্যয় ও পূর্ণ আস্থার সাথে এ বিষয়ে আন্তঃর্জাতিক জনমত গঠন করেছেন যে গনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ার (স্বাধীনতা) সংগ্রাম সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। ডাচ সরকার যখন যোগ জাকার্তার রাষ্ট্রীয় কার্যালয় ইন্দোনেশিয়াতে আক্রমণ চালিয়ে দখল করে, সে সময়ও তিনি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ণ সহযোগীতা জারী রাখেন।

জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাকার্তা থেকে যখন ডাচ সেনাদের অপসারণ করা হয় এবং জাকার্তায় নতুন সরকার গঠন হয়, তখনও তিনি সেই কমিটির সদস্য ছিলেন যা নতুন ভাবে গনতান্ত্রিক ইন্দোনেশিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য বানানো হয়েছিল। (এরপর এ উদ্ধৃতিতেই লিখেছে) প্রেসিডেন্ট সুকার্ন ডাচ সরকারের নজরবন্দীর পর যখন যোগ জাকার্তা আসেন তখন তিনি সে কমিটিরও সদস্য ছিলেন যারা প্রেসিডেন্ট সুকার্নকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল।

ডাচ সরকারের কাছ থেকে ক্ষমতা নেয়ার পর প্রেসিডেন্ট সুকার্ন যখন জাকার্তা আসেন তখন তিনিও সুকার্নর সহযাত্রী কাফেলায় ছিলেন এবং তাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ভিনদেশী ছিলেন। যখন সরকারের দপ্তরসমূহ যোগ জাকার্তায় গঠিত হয় তখন তিনি রেডিও রিপাবলিক ইন্দোনেশিয়ার সম্প্রচার বিভাগের সাথে যুক্ত হয়ে উর্দু অনুষ্ঠানে খুব ভালভাবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। পরবর্তীতে আহমদীয়া মুসলিম মিশন ইন্দোনেশিয়ার ইনচার্য রূপে দায়িত্ব পালন করেন।

আমি পূর্বেই বলেছি, ইন্দোনেশিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট আহমদীদের কুরআন পড়েছেন। তিনি তার এক পুস্তক ইন্দোনেশিয়ান ভাষায় যার নাম 'ডি বাওয়া বেন্ডেরা রেভুলুসি'তে লিখেছেন,'যদিও আমি কিছু বিষয়ে আহমদীয়াতের সাথে একমত নই বরং অস্বীকার করি, তবুও এর শিক্ষা ও কল্যান সমূহের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তাদের কাছ থেকে যেসব লিখিত রচনাবলী আমি পেয়েছি সেগুলো বিবেক সম্মত, যুগোপযোগী ও উন্মুক্ত চিন্তাধারা সৃষ্টিকারী।' (পৃ-৩৪৬)

সুতরাং তাদের কুরবানী শুধু মৌখিক এবং পরামর্শ দেয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং ১৯৪৬ ইং সনে স্বাধীনতার ঘোষনার পর কিছু আহমদী সদস্য প্রান বিসর্জন দিয়ে শহীদদের কাতারে অন্তর্ভূক্ত হন। তন্মধ্যে একজন হচ্ছেন আমাদের মোকাররম রাডীন মুহিউদ্দীন সাহেব যিনি ইন্দোনেশিয়া জামা'তের সদর এবং ইন্দোনেশিয়া কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি ইন্দোনেশিয়ার প্রথম স্বাধীনতা উৎসবের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। ডাচ সেনারা তাকে অপহরণ করে এবং পরে শহীদ করে।

সুতরাং দেশের স্বাধীনতা অর্জনে আহমদীদের রক্তও ঝড়েছে। এতো গেলো ইন্দোনেশিয়ায় দেশের জন্য আহমদীয়া জামা'তের কুরবানী এবং তাদের কর্মকান্ড ও সেবার বিবরণ। কিন্তু সাথে সাথে উলামা ও চরমপন্থী দলগুলো তাদের অত্যাচার ও জুলুম নীপিড়ন জারী রাখে। এখন আমি ইন্দোনেশিয়ার কয়েকজন পুরাতন শহীদের বিবরণ পেশ করব। ১৯৪৭ সনে নিম্নবর্ণিত সাত জন আহমদীকে শহীদ করা হয়।

মোকাররম জাভেদ সাহেব, মোকাররম সুরা সাহেব, মোকাররম সায়েরী সাহেব, মোকাররম হাজী হাসান সাহেব, মোকাররম রাডীন সালেহ সাহেব, মোকাররম দাহলান সাহেব। এ ছয় জন আহমদী সাঙ্গাপারনা ওয়েষ্ট জাভা গ্রামে শাহাদত বরন করেন। ওহাবী মুভমেন্টের দারুল ইসলাম নামের একটি দল লাঠি এবং পাথর দ্বারা এ আহমদীদের উপর প্রচন্ড আক্রমণ চালায়।

তাদেরকে তাদের পরিবারের চোখের সামনেই তাদের ঘরের মধ্যে নির্মম ভাবে আঘাত করতে করতে টেনে হিচড়ে গ্রামের বাইরে নিয়ে যায় এবং মারতে মারতে শহীদ করে। আক্রমণের পূর্বে দারুল ইসলাম গ্রুপ তাদেরকে আহমদীয়াত ত্যাগের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু তারা সবাই আহমদীয়াতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকেন এবং ধৈর্য্য ধারন করেন।

আহমদীদের সাথে সেখানে যে নির্দয় আচরণ হচ্ছে তা অনেক পুরনো। এর দু'বছর পর ১৯৪৯ সনে নিম্ন বর্ণিত আহমদী বন্ধুগণ শাহাদতের স্বাদ লাভ করেন। মোকাররম সানুসী সাহেব, মোকাররম উমু সাহেব, মোকাররম তাহইয়ান সাহেব, মোকাররম সাহরুমী সাহেব, মোকাররম সোমা সাহেব, মোকাররম জুমলী সাহেব, মোকাররম সারমান সাহেব, মোকাররম উসুন সাহেব। মোকাররমা ইডট সাহেবা এবং মোকাররমা উনিয়াহ সাহেবা এ দুজন মহিলাও শাহাদতের পুরস্কার লাভ করেন।

এ আহমদীগণ সাঙ্গাপারনা ওয়েষ্ট জাও এর SANGIANG LABONG গ্রামে শাহাদত বরন করেন। এদেরও ওহাবী মুভমেন্টের দারুল ইসলাম গ্রুপ লাঠি, পাথর ও ইট দ্বারা আক্রমণ চালিয়ে শহীদ করে। এদেরও টেনে হিচড়ে গ্রামের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে নির্দয় ভাবে মারতে মারতে শহীদ করা হয়। এদেরও জোরপূর্বক আহমদীয়াত ত্যাগ করতে বলে। কিন্তু তারা সবাই (আহমদীয়াত ত্যাগ করতে) অস্বীকার করে এবং ধৈর্যধারন করে ও অবিচল থাকে।

এরপর ২০০১ সালে আহমদীয়া জামা'তের তীব্র বিরোধীতা শুরু হয়। মোকাররম পাপুক হাসান সাহেবকে ২২শে জুন ২০০১ সালে শহীদ করা হয়। পশ্চিম লাম্বুকের একটি গ্রাম 'লালওয়া' জামাতে প্রায় একশ আহমদীয়া বিরোধী আক্রমণ চালায়। বিরোধীরা জামা'তের মসজিদ ধ্বংশ করতে চাচ্ছিল। পাপুক হাসান সাহেব আহমদীদের সাথে নিয়ে বিরোধীদের আক্রমণের সামনে বুক পেতে দাড়ান এবং গুরুতর আহত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পরে যান। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতাল নেয়া হয়। কিন্তু অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারনে পথেই তিনি শাহাদত বরন করেন। শাহাদতের সময় তার বয়স হয়েছিল পঞ্চান্ন বছর।

২০০২ সালে সরকারী আমলারাও বিরোধীদের সাথে হাত মেলায়। এসব যালেমরা বিভিন্ন ভাবে নির্যাতন চালাতে থাকে। 'মানিস্‌লর' অঞ্চলে বিরোধীরা আহমদীদের মসজিদ ও বাড়ী ঘরে পাথর বর্ষন করে। দুটি মসজিদ ও বিয়াল্লিশটি আহমদী ঘরের কাঁচ প্রভৃতি ভাংচুর করে। স্থানীয় সরকার মানিস্‌লর জামা'তের কার্যক্রম বন্ধ

করার জন্য নির্দেশ জারী করে যে আহমদীগণ তাদের মসজিদ ব্যবহার করতে পারবে না। ১৫ই জুলাই ২০০৫ সনে ইন্দোনেশিয়া জামা'তের কেন্দ্রীয় মসজিদ এবং কেন্দ্রে বিরোধী দলের শত শত লোক আক্রমণ চালায় এবং জামা'তী বিল্ডিং সমূহ এবং সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করে। পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখে। কিছু কিছু স্থাপনায় অগ্নিসংযোগ করা হয়। সমগ্র কেন্দ্র, মসজিদ ও মিশন হাউস সমূহ, জেলা ব্যবস্থাপনার অফিস সমূহ এবং অন্যান্য বিল্ডিং সমূহ সরকার সীল করে দেয়। এ সরকারও এখন তাদের সাথে হাত মিলিয়েছে।

১৯শে সেপ্টেম্বর ২০০৫সনে পাঁচশ বিরোধী সিয়ানজুর রিজিওনের পাঁচটি জামাতে আক্রমন চালায়। পাঁচটি জামা'তের মসজিদেই ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি করা হয়। দরজা, জানালা, কাঁচ প্রভৃতি ভাংচুর করা হয়। মিশন হাউস সমূহেরও ক্ষতি সাধন করা হয় এবং জিনিষপত্র লুটপাট করা হয়। অনেক জিনিষপত্র জ্বালিয়ে দেয়া হয়। ছিয়াশিটি ঘরের ক্ষয়-ক্ষতি ও ভাংচুর করা হয়। কিছু ঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়। জিনিষপত্র লুট করা হয়। কিছু স্থানে আহমদীয়া বিদ্যালয়েরও ক্ষতি সাধন করা হয়। এসব জামা'তের আহমদীদের গাড়ী ও মোটর সাইকেলসমূহও পুড়িয়ে দেয়া হয়।

১৯শে অক্টোবর রাত নয়টার সময় শতাধিক বিরোধী 'কিটাপাঙ' জামাতে হামলা চালায়। তিনটি আহমদী ঘরের ক্ষয়-ক্ষতি করে। দু'জন আহমদী বন্ধু আহত হন। এ জামা'তের সদস্যরা এর পূর্বে 'পাঙ্কুর' এবং 'সিলঙ' অঞ্চলে বসবাস করত। সেখানে ২০০২ সালে বিরোধীরা হামলা চালিয়ে তাদেরকে তাদের ঘর বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছিল এবং তাদের ঘর বাড়ী ও মসজিদ পুড়িয়ে দিয়েছিল। এরপর তারা সেখান থেকে হিজরত করে 'কিটাপাঙ' অঞ্চলে চলে আসে। অক্টোবর ২০০৫ সনে এখানেও বিরোধীরা হামলা চালায়। কিন্তু সব স্থানেই তারা দুঃখ কষ্ট সহ্য করে এবং ঈমানে অটল থাকে।

ফেব্রুয়ারী, ২০০৬ এ পশ্চিম লম্বুক দ্বীপের 'কিটাপাঙ' জামা'তের উপর হামলা হয়, তেইশটি ঘর ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়, ছয়টি ঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়। জামা'তের সদস্যদের দোকানপাটের ক্ষয়-ক্ষতি করা হয়। তাদের গৃহস্থালির জিনিষপত্র লুট করা হয়। জামা'তের ১২৯ জন সদস্য ঘর-বাড়ী হারায় এবং তাদের এ অঞ্চল ত্যাগ করতে হয়।

১০ই নভেম্বর, ২০০৭ 'পাঙ্গাওবান' গ্রামে স্থানীয় মৌলভীর নেতৃত্বে মাদ্রাসার ছাত্ররা আমাদের মসজিদ ভেঙ্গে ফেলে এবং ২৬ জন আহমদীকে সেখান থেকে অন্য এলাকায় চলে যেতে হয়।

সেপ্টেম্বর, ২০০৭ এ সিঙ্গাপারানার মসজিদে মাহমুদে বিরোধীদের পক্ষ থেকে তৃতীয় বার হামলা হয়। মসজিদের সব জানালা ভেঙ্গে ফেলা হয়। ছাদেরও ক্ষতি করা হয়। অফিসের জিনিষপত্র ও আসবাবপত্র ভেঙ্গে ফেলা হয়।

১৮ই ডিসেম্বর, ২০০৭ পাঁচ সহস্রাধিক বিরোধী 'মানিসলর' জামাতে আক্রমণ চালায়। ডিফেন্স ফ্রন্ট ও মজলিশে মুজাহিদিন ইন্দোনেশিয়ার সাথে এ বিরোধীদের সম্পর্ক ছিল। জামা'তের দুটি মসজিদ ক্ষতিগ্রস্থ করে। ভাংচুর করা হয় এবং মসজিদের জিনিষপত্রের ক্ষয়-ক্ষতি করে। কুরআন করীমের বারটি কপি জ্বালিয়ে দেয়। পুলিশ নয়টি মসজিদ সিল করে দেয়। ঘর বাড়ী ক্ষতিগ্রস্থ করা হয় এবং ভাংচুর চালানো হয়। তিন জন আহত হয়।

যাই হোক, এজন্য লোকদের সেখান থেকে বের হতে বাধ্য করা হয়। ওখানে বিভিন্ন স্থানে এখন পর্যন্ত এ অবস্থাই বিরাজমান। এই হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার অবস্থা, সেখানকার আহমদীদের সাথে এ আচরণ হচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার অশেষ কৃপায় ঈমানে দৃঢ়তা প্রদর্শন করে তারা ঈমানে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং ধৈর্য, সাহস ও দোয়ার মাধ্যমে সব অনিষ্টের মোকাবেলা করে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক যে কয়েকজনকে শহীদ করা হয়েছে তা গত কয়েক বছর থেকে সেখানে যে যুলুম নির্যাতন শুরু হয়েছে তারই ফল। কিন্তু এবার স্থানীয় গণমাধ্যমগুলোও এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লিখেছে এবং বহিঃর্বিশ্বের গণমাধ্যমগুলোও লিখেছে এবং এটি বেশ ফলাও করে প্রচার হয়েছে। যারা শহীদ হয়েছে এখন আমি তাদের যিকরে খায়ের করব।

এদের মধ্যে প্রথম শহীদ হচ্ছেন মোকাররম তোবাকুস চান্দ্রা মোবারক সাহেব। তিনি জন্মগত আহমদী ছিলেন। তার বয়স ছিল ৩৪ বছর। জামা'তের কেন্দ্রে থাকতেন। তিনি তার এক স্ত্রী রেখে গেছেন যিনি পাঁচ মাসের গর্ভবতী। বিয়ের আট বছর পর এটিই প্রথম সন্তান হবে। তার ইচ্ছা ছিল বাচ্চা ওয়াক্‌ফ করবেন। তিনি ওয়াকফে নও এর কাগজপত্রও তৈরী করেছিলেন এবং কেন্দ্রে প্রেরন করতে প্রস্তুত ছিলেন। ইনশাআল্লাহ (কাগজপত্র) কেন্দ্রে এসে যাবে এবং বাচ্চা ওয়াকফে নও এ অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।

চান্দ্রা সাহেব জামা'তের সেক্রেটারী যেরাআত ছিলেন এবং জামা'তের কেন্দ্রে জামা'তের যে জমি ছিল তিনি সেটির দায়িত্বে ছিলেন। খুব নিষ্ঠাবান এবং জামা'তের খুব কর্মঠ কর্মী ছিলেন। নিয়মিত চাঁদা আদায় করতেন। তার পরিবারের সবাই খুব নিষ্ঠাবান আহমদী। ঘটনার এক দিন পূর্বে তার স্ত্রী তাকে বলেন, cikesik জামাতে (যেখানে হামলা হয়েছিল) যেওনা। আমি পাঁচ মাসের গর্ভবতী, আমার প্রতি এখন আপনার যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। আমার প্রতি যত্নবান হোন অথবা জামা'তের প্রতি।

তিনি তখন বলেন, এখন জামা'তকে প্রাধান্য দিব। শুধু ড্রাইভার (চালক) হিসেবে সেখানে যাবেন এবং কর্তব্যরত খোদ্দামদের সেখানে পৌঁছে দেবেন। কিন্তু তখনই সেখানে হামলা হয়। মরহুম তার কর্মকর্তাদের সাথে খুব ভাল ব্যবহার করতেন। সব নামায মসজিদে বাজামা'ত আদায় করতেন। স্ত্রীকেও এ ব্যাপারে উপদেশ দিতেন যে সময়মত নামায আদায় হওয়া দরকার। একজন সাহসী খাদেম ছিলেন।

তোবাকুস চান্দ্রা মুবারক সাহেব মিশন হাউসের ভেতরে ছিলেন এবং তিনি সব খোদ্দামদের সামনে ছিলেন। বিরোধীরা তার দেহে ছুড়ি দ্বারা অনেক আঘাত করে এবং নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে।

এরপর বিরোধীরা তাকে ঝুলিয়ে আঘাত করতে থাকে। পরে নিচে নামিয়ে তার লাশে লাঠি ও পাথর দ্বারা আঘাত করতে থাকে এবং লাশের চেহারা বিকৃত করে। প্রথমে তার লাশ চেনা যায়নি। পরে চান্দ্রা সাহেবের ছোট ভাই এসে তার দেহের একটি চিহ্ন দেখে লাশ সনাক্ত করে যে এটি তার ভাই চান্দ্রা সাহেবের লাশ।

দ্বীতিয় শহীদ আহমদ ওয়রসুনো সাহেব। তিনি উত্তর জাকার্তার অধিবাসী ছিলেন। তার বয়স ছিল ৩৮ বছর। ২০০২ সালে তিনি বয়আত করার সৌভাগ্য পান। স্ত্রী ছাড়াও তার চার সন্তান রেখে গেছেন। তিনি ২০০০ সালে আহমদীয়াত সম্পর্কে জানতে পারেন, যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহ.) ইন্দোনেশিয়া গিয়েছিলেন।

এক আহমদী বন্ধু তাকে জামা'তী পুস্তক পড়তে দেয়। তিনি খুব আগ্রহের সাথে পড়েন এবং দু বছর যাচাই করার পর বয়আত গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীতে তার স্ত্রীও বয়আত গ্রহণ করেন এবং খুব শিঘ্র আহমদীয়াতের সত্যতার উপর দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হন। আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে তিনি তার পিতামাতার সাথে ভাল আচরণ করতেন না। কিন্তু আহমদীয়াত গ্রহণের পর তার পিতামাতা তার প্রতি খুব সন্তুষ্ট হন, কারন তার চরিত্র পাল্টে যায়।

পিতামাতাকে সম্মান করতে থাকেন ও তাদের সাথে কোমল আচরণ করতে থাকেন। আধ্যাত্মিকতায়ও অনেক উন্নতি সাধন করেন। তিনি বলতেন, আমি যখন তবলীগ করি তখন ঐশী সাহায্য অনুভব করি এবং খোদা তাআলা আমার প্রয়োজন পূর্ণ করেন। ঘর ভারা আদায় এবং দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য একদিন তার খুব টাকার প্রয়োজন পরল। তিনি খুব দোয়া করলেন। কিছুক্ষণ পর এক ব্যাক্তি আসল এবং তাকে কাজ করানোর জন্য নিয়ে গেল। এথেকে তিনি যে অর্থ পান তা থেকে তার প্রয়োজন মিটল। তার খুব ইচ্ছা ছিল জীবনে অন্যের উপকার করবেন। তিনি স্বপ্নে হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.), হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.), হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রা.) ও হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহ.) এর সাক্ষাত লাভ করেন। তিনি কয়েকজনকে বয়াতও করান। তার তবলীগের খুব আগ্রহ ছিল। খুব সাহসী ছিলেন। (আহমদীয়াতে) পরে এসেও অনেকের চেয়ে এগিয়ে গেছেন।

তার শাহাদতের ঘটনা এরূপ : যখন আক্রমণ হয় ওয়ারসুনো সাহেব তখন মিশন হাউসের ভিতরে ছিলেন। বিরোধীরা তাকে ছুড়ি, কাচি এবং লাঠি দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করে হত্যা করে। তার লাশ বাইরে বের করে আনা হয় এবং পুলিশ ও লোকজনের সম্মুখেই বিরোধীরা তার লাশে আঘাত করতে থাকে। পুলিশ দাঁড়িয়ে তামাশা দেখতে থাকে। তার লাশও প্রথমে সনাক্ত করা যায়নি। এমনকি আরেকজন খাদেম ভুলক্রমে তাকে অন্য ব্যাক্তি মনে করে। কিন্তু পরে যখন ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় তখন বোঝা যায় তিনি ওয়ারসুনো সাহেব, অন্য খাদেম নন।

তৃতীয় শহীদ রুনি পসারানী সাহেব। শাহাদতের সময় তার বয়স ছিল ৩৫ বছর। ১১ই জানুয়ারী, ২০০৮ এ তিনি বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। বয়আতের কেবল দু'বছর হয়েছিল। তিনি উত্তর জাকার্তার অধিবাসী ছিলেন। আপনজনদের মধ্যে স্ত্রী এবং ৫ ও ৬ বছর বয়সের দু'টি সন্তান রেখে গেছেন। বয়আতের পূর্বে তিনি খুনি, ডাকাত ও জুয়ারী ছিলেন। ওয়ারসুনো সাহেবের (যিনি নিজেও শহীদ হয়েছেন) তবলীগে তিনি আহমদীয়াত সম্পর্কে জানতে পারেন।

এক রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন, পাগড়ী পরিহিত এক বুযুর্গের সাথে সাক্ষাত করছেন। ঘটনাক্রমে একদিন তিনি ওয়ারসুনো সাহেবের সাথে সাক্ষাত করতে তার ঘরে আসেন। দেয়ালে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর ছবি দেখে বলেন, আমি স্বপ্নে এ ব্যাক্তিকে দেখেছিলাম। এভাবে তিনি আহমদীয়াতের খুব সান্যিধ্যে চলে আসেন এবং জামা'তী বই পুস্তক পড়েন। এরপর ২০০৮ সালে রুনি সাহেব বয়আত করার সৌভাগ্য পান। আহমদীয়াত গ্রহণের পর তার অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল।

তার স্ত্রী অবাক হয়ে যায় যে রুনি সাহেবের মধ্যে আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধিত হয়েছে। তার কোন না কোন পূণ্য আল্লাহ্ তাআলা পছন্দ করেছেন যেজন্য এত বড় পুরস্কার দিয়েছেন যে প্রথমে সব মন্দ কাজ ছেড়ে আহমদীয়াত গ্রহনের সৌভাগ্য লাভ করেছেন, এরপর শাহাদতের মর্যাদাও লাভ করেছেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়া তাহাজ্জুদের নামাযও পড়তেন এবং নিয়মিত জামা'তী বইপত্র পড়তেন।

নিয়মিত চাঁদা আদায় করতেন। খুব সাহসী ছিলেন। আহমদী হবার পর যে দু'বছর পেয়েছেন তাতে অনেক তবলীগ করেছেন। তার তবলীগে কয়েকটি বয়আতও হয়েছে।

তার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিষয় রয়েছে, তিনি বেশ কয়েকবার বলেছেন,'আমার শহীদ হয়ে মৃত্যু বরনের খুব ইচ্ছা হয়'। আল্লাহ্ তাআলা তার এ ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন।

মোকাররম রুনি পাসারানী সাহেবের শাহাদতও মোকাররম ওয়ারসুনো সাহেবের ন্যায়। বিরোধীরা তাকেও ছুরি, কাচি এবং লাঠি দ্বারা আঘাত করে হত্যা করে। তার লাশ বাইরে বের করে আনা হয় এবং বিকৃত করে অবমাননা করা হয়।

এরা ঐসব লোক যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তারা চির জীবন লাভ করবে। এরা আহমদীয়াতের আকাশের উজ্জল নক্ষত্র। আল্লাহ্ তাআলা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে থাকুন এবং তাদের স্বজনদের ধৈর্য ও সাহস দান করুন এবং স্বয়ং তাদের হাফেয (সংরক্ষক) ও নাসের (সাহায্যকারী) হোন, ইন্দোনেশিয়া জামা'তের প্রত্যেক সদস্যকে ঈমানে পূর্বের চাইতে অধিক দৃঢ়তা দান করুন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যে কাশফ (দিব্য দর্শন)-এর উল্লেখ করে হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেব শহীদ-এর পদাঙ্ক অনুসরনকারী আরো কিছু লোকের মিলিত হবার কথা বলেছিলেন তাদের মধ্যে দূর-দূরান্তে বসবাসকারী এসব লোকেরাও অন্তর্ভূক্ত। তাদের মধ্যে অনেকেই আহমদীয়াতের খলীফাদের কোন একজনকেও দেখেন নি। কিন্তু তাদের ঈমানের দৃঢ়তা অতুলনীয়, খিলাফতের সাথে তাদের বিশ্বস্ততার সম্পর্ক অনুসরনীয়।

পূর্বের কয়েকটি খুতবাতে আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর কাশফের (দিব্যদর্শনের) কথা উল্লেখ করেছি, এখন পুণরায় এটি বলছি। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বর্ণনা করেন কাশফটি এমন ছিল, কাশফী (দিব্যদর্শনের) অবস্থায় আমি দেখলাম আমাদের বাগান থেকে একটি উঁচু গাছের শাখা ... কাটা হল। আমি বল্লাম এ শাখাটি মাটিতে পুণরায় পুতে দাও যেন সেটি বৃদ্ধি পায় এবং বিস্তৃত হয়। তিনি (আ.) বলেন, আমি এটির এ তা'বীর (ব্যাখ্যা) করলাম যে খোদা তাআলা তার সমপর্যায়ের আরো

অনেককে সৃষ্টি করবেন'। (তাযকেরাতুশ শাহাদাতায়ন, রুহানী খাযায়েন, খন্ড-২০, পৃ-৭৫,৭৬)

অর্থাৎ হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেব শহীদ-এর সমপর্যায়ের অনেককে সৃষ্টি করবেন। সুতরাং এ শহীদগণতো তাদের উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করে অনুসরনীয় দৃষ্টান্ত রেখে এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে আপন প্রভুর সমীপে উপস্থিত হয়েছে এবং কাদিয়ান থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা প্রমানকারী হয়েছেন। এখন আমরা যারা পিছনে রয়ে গেছি আমাদেরও সর্বদা নিজেদের ঈমানী অবস্থা যাচাই করা প্রয়োজন।

প্রত্যেক শাহাদতের পর এ অঙ্গীকার করা প্রয়োজন যে আমরা এ অত্যাচারের কারনে ঈমান নষ্ট হতে তো দেবই না বরং ঈমানে আরো বৃদ্ধি পাওয়ার চেষ্টা করব। এমন ধরনের কোন আচরণ করব না যাতে আমাদের সম্মান ও ধৈর্যের উপর কথা উঠে, যে কারনে নিজ দেশের সাথে বিশ্বস্ততার উপর কোন কথা উঠে। আমি পূর্বে বলে এসেছি, ইন্দোনেশিয়া গঠনেও আহমদীয়া জামা'ত ভূমিকা রেখেছে।

আহমদীয়া জামা'তের প্রত্যেক সদস্য সে যে দেশেই থাকুক সে দেশের সাথে বিস্বস্ততা রক্ষাকারী হবে আর ইনশাআল্লাহ সর্বদা (বিশ্বস্ত) থাকবে। এটি হওয়া অত্যাবশ্যক। এটা বিশ্বস্ততার দাবী যে আমরা যেন এ দোয়াও করি, আল্লাহ্ তাআলা আমাদের দেশকে অত্যাচারীদের কবল থেকে মুক্ত করুন এবং আমাদের উপর কখনো এমন শাসক নিযুক্ত না করুন যে রহম (দয়া) করতে যানে না। আমরা পার্থিব তদবীরের (কাজকর্ম) জন্য আইনের আশ্রয় গ্রহণ করি, কিন্তু আইন নিজের হাতে তুলে নেই না। আমরা আমাদের প্রভুর সমীপে বিনত হই।

আইনের আশ্রয় গ্রহণ করার চাইতে আল্লাহ্ তাআলার সমীপে ঝুকতে আমরা বেশী ভরসা রাখি। আল্লাহ্ তাআলার নিকট দোয়া করে তার সাহায্যের উপর আমরা বেশী ভরসা রাখি। তার করুনার উপর আমরা ভরসা রাখি। সর্বদার ন্যায় এখনও আমরা আল্লাহ্ তাআলার কাছে বিনত হব। সর্বদা এ দোয়া করতে থাকুন,'রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাও ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাউমিল কাফিরীন'।

আল্লাহ্ তাআলা করুন আমাদের মধ্যে কারো দৃঢ় পদক্ষেপে কখনো যেন পদস্খলন না আসে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কথা বলতে গিয়ে এক স্থানে বলেন, 'তিনি (সা.) সাহাবাদের (রা.) ধৈর্য্যের শিক্ষা দিয়েছেন। অবশেষে সব শত্রু ধ্বংশ হয়ে গেল। অচিরেই তোমরা সেই যুগ দেখতে পাবে যে এসব দুষ্ট লোক দৃষ্টিগোচর হবে না। আল্লাহ্ তাআলা ইচ্ছা করেছেন এ পবিত্র জামা'তকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করবেন'।

তিনি (আ.) আরো বলেন, 'আল্লাহ্ তাআলা যদি চাইতেন তবে এসব লোকেরা কষ্ট দিত না এবং কষ্ট প্রদানকারীরা সৃষ্টি হত না। কিন্তু খোদা তাআলা এদের মাধ্যমে ধৈর্যের শিক্ষা দিতে চান'।

তিনি (আ.) আরো বলেন,'যে ব্যাক্তি কষ্ট দেয় তার শেষ পরিনতি এই হয় যে হয় সে তওবা করে, নতুবা ধ্বংশ হয়ে যায়'। (মলফুযাত, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৪৩)

যারাই আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ সংশোধিত হবে বা তওবা করবে, নয়তো ধ্বংশ হয়ে যাবে। সুতরাং নিজের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সব আহমদীর দায়িত্ব দোয়া ও ধৈর্যের সাথে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকা। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে ধৈর্য ধারনের শক্তি দান করুন এবং দুষ্ট লোকদের বিনাশ করুন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তাআলা যে অঙ্গীকার করেছেন, আমরা যেন তা পূর্ণ হতে দেখি।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে তাঁর আশ্রয় প্রদান করুন এবং শত্রুদের শাস্তি দিন। বিরোধীদের সাথে আমাদের ব্যাক্তিগত কোন শত্রুতা নেই। আহমদীদের সাথে যে শত্রুতা ও বিরোধীতা হচ্ছে তা সবই হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বিরোধীতার জন্যই হচ্ছে। এখন সর্বত্র এটি চরম সীমায় পৌঁছেছে।

আল্লাহ্ তাআলা শত্রুদের দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা দিন এবং আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টিতে যাদের সংশোধন নির্ধারিত নেই শীঘ্র তাদের শাস্তির উপকরণ সৃষ্টি করুন। যারা আহত হয়েছে তাদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তাআলা শীঘ্র তাদের সুস্থতা দান করুন। আহত তিনজন এখনো হাসপাতালে আছেন। এছাড়া দুজনকে হাসপাতাল থেকে রিলিজ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলার ফযলে তারা এখন সুস্থ আছেন। ইন্দোনেশিয়ান আহমদীদেরও আমি বিশেষভাবে এটি বলতে চাই, সব আহমদীদের দোয়া আপনাদের সাথে আছে। আমার কাছে বিভিন্ন স্থান থেকে চিঠি আসছে যেগুলোতে আপনাদের জন্য উদ্বিগ্নতা ও অস্থিরতা প্রকাশ করা হচ্ছে। সেখানে বিভিন্ন ওয়েব সাইট প্রভৃতিতে অত্যাচারের যে চিত্র দেখানো হয়েছে তা সব আহমদীকে দুঃখ ও যন্ত্রনায় কাতর করেছে। এজন্য তারা আপনাদের জন্য দোয়া করছেন। আল্লাহ্ তাআলা সব আহমদীকে আপন হেফাযতে রাখুন এবং ভবিষ্যতে সব অনিষ্ট থেকে আহমদীদের রক্ষা করুন। আর শত্রুদের পরিকল্পনা উল্টো তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিন।

আজ আমি এসব শহীদদের গায়েব জানাযার নামায পড়ব। এর সঙ্গে মর্দানেও গতকাল একটি ঘটনা ঘটেছে। পাঞ্জাব রেজিমেন্টে আত্মঘাতী হামলায় সেখানে প্রশিক্ষণরতদের মধ্যে কয়েকজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে আমাদের একজন আহমদী যুবকও অন্তর্ভূক্ত যে সবেমাত্র ভর্তি হয়েছিল। সে বেগোয়ালের অধিবাসী ছিল এবং প্রশিক্ষণরত ছিল। সম্ভবত পাসিং আউট প্যারেড বা অন্য কিছু ছিল । সেও এ ঘটনায় শহীদ হয়েছে। তাকেও এ জানাযায় অন্তর্ভূক্ত করে নিন। আল্লাহ্ তাআলা তার সাথে ক্ষমার আচরণ করুন। সে আমাদের দু'জন জীবন উৎসর্গকারী মুবাল্লেগ মাহমুদ আহমদ মুনীর সাহেব মুরুব্বী সিলসিলাহ এবং মুবাশ্বের আহমদ সাহেবের ভাতিজা ছিলেন। তার বয়স হয়েছিল মাত্র একুশ বছর। আল্লাহ্ তাআলা তার পিতামাতাকেও ধৈর্য, শক্তি ও সাহস দান করুন। (আমীন)

অনুবাদঃ **আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ**
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ৮৭তম সালানা জলসা উপলক্ষে ৬ই ফেব্রুয়ারী ২০১১-এ লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্‌'তে প্রদত্ত হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর

উদ্বোধনী ভাষণ

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ * اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين

''আমি বিশেষ করে বাংলাদেশ জামাতের প্রশাসন ও অঙ্গসংগঠনগুলোর উদ্দেশ্যে বলছি, আপনাদের কার্যক্রমে গতি সঞ্চার করুন। একটি বাস্তবধর্মী ও উৎকর্ষ কর্মসূচি হাতে নিন এবং তবলীগ বা সত্যের বাণী দেশের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছিয়ে দিন''।

''আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর প্রচার করতে হলে প্রথমে আমাদেরকে নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থার সংশোধন করতে হবে। প্রত্যেক আহমদীর নিজেকে আহমদীয়াতের দূত মনে করতে হবে। কর্ম, সেই শিক্ষা সম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয় যা আমরা প্রচার করছি। আর তা হল, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ শরিয়তের শেষ গ্রন্থ, পবিত্র কুরআন। যাঁর আগমনের মাধ্যমে শরিয়ত পূর্ণতা লাভ করেছে''।

''সর্বদা স্মরণ রাখবেন, ব্যক্তির সমষ্টিগত নেককর্ম জামাতকে দৃঢ় করে থাকে। যদি এই সৎকর্মশীলরা পূর্ণ আনুগত্যের চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে এক নেতার কথানুসারে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে আহ্বান করতে থাকে তাহলে তারা পৃথিবীতে একটি বিপ্লব সাধনকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে''।

''আমি জামাতের ব্যবস্থাপনা এবং খোদ্দাম, আনসার ও লাজনাসহ সকল অঙ্গ-সংগঠনকে বলছি, নিজেদের দায়িত্বাবলী সম্পর্কে সচেতন হোন এবং আমানত যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রত্যর্পণ করুন। শুধু সদস্যদের কাছে পরিপূর্ণ আনুগত্যের আশায় বসে থাকবেন না বরং নিজেদের দায়িত্বও যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করুন''।

''আমাদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় দাওয়াত ইলাল্লাহ্ বা সত্য প্রচারের কাজ আরো কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে, তাই আমাদের প্রচারব্যবস্থাকে (তবলীগ) আরও সঙ্গতিপূর্ণ করা প্রয়োজন''।

এখন আমি আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের, সালানা জলসায় উদ্বোধনী ভাষণ প্রদানের জন্য দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ জামাতের এই সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এটি নতুন স্থানে। এটি এজন্য ভাড়া নেয়া হয়েছে যাতে অধিক সংখ্যক লোক জলসায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, বিরোধীদের একটি দল সেখানে জলসা বন্ধ করানোর দুরভিসন্ধি নিয়ে প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মিছিল বের করেছে আর তাদেরকে জলসা বন্ধ করতে বাধ্য করেছে। আসলে এটা জাতীর দুর্ভাগ্য বলতে হবে কেননা, আমাদের যতটুকু সম্পর্ক আছে, আল্লাহ্ তা'আলা সকল প্রতিকূল অবস্থাকেই আমাদের অনুকূলে নিয়ে আসেন।

মোটকথা সেখানকার চিত্র হলো, প্রশাসন আমাদেরকে মাত্র কিছুক্ষণের জন্য জলসার কার্যক্রম চালিয়ে যাবার অনুমতি দিয়েছে। তাই এই অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে নযমও সংক্ষিপ্ত করিয়েছি আর এখন আমি বক্তৃতাও সংক্ষিপ্ত করবো। তাদের জন্য দোয়া করুন, যেন সেখানকার বৈরী পরিস্থিতিকে আল্লাহ তা'লা সহজ করে দেন।

আমি বলেছি, পুলিশ ও প্রশাসন আমাদেরকে কিছুক্ষণ সময় দিয়েছে অর্থাৎ ৫টার মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ করতে বলেছে। আমরা আহমদীরা সর্বদা আইন মান্য করে থাকি আর ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা আমাদের এটিই শিখিয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ তা'আলা এই সময়ের মধ্যেই জলসা বা অনুষ্ঠান আমরা সমাপ্ত করব। কেননা আমি পূর্বেই বলেছি কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় বরং আমরা শান্তিপ্রিয় ও শান্তিকামী মানুষ। তাই সরকারের সকল নির্দেশের প্রতি আনুগত্য করা এবং তা মেনে চলা আমাদের জন্য আবশ্যক; যেন দেশে সার্বিক শান্তি বিরাজ করে। আমরা সেই মহান নবী (সা.)-এর অনুসারী, যিনি শান্তি ও মিমাংসার লক্ষ্যে কাফিরদের একতরফা শর্তকেও মাথা পেতে মেনে নিয়েছিলেন কিন্তু কোন প্রকার অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন নি। এই স্থানে যেহেতু জলসা অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয় তাই হয়ত জামাতের নিজস্ব জায়গায় জলসা স্থানান্তরিত হবে আর সেখানেই অনুষ্ঠিত হবে। ততটা পরিব্যাপ্তি না হলেও জলসা সীমিত পরিসরে চলতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'আলা। বাহির থেকে যারা এসেছেন তারা এতে অবশ্যই অংশ গ্রহণ করবেন। কিন্তু এই প্রশস্ত জায়গায় জলসা করে জামাতের পক্ষ থেকে বিশ্ববাসীর কাছে ইসলামের সুন্দর বাণী পৌঁছাবার যে ইচ্ছা আমাদের ছিল; এদের দুর্ভাগ্য, এরা তা থেকে বঞ্চিত থাকবে।

প্রথম কথা আমি এটি বলতে চাই, বাংলাদেশের যারা জলসার উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছেন, তাদের উচিত হবে এই দিনগুলোতে নিজেদের সময়কে, প্রতিটি মুহূর্তকে, দোয়ার মাঝে অতিবাহিত করা। আর সারা বিশ্বের আহমদীদেরও উচিত হবে তাদেরকে দোয়ায় স্মরণ রাখা। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা একদিন অবশ্যই আমাদের দোয়ার ফল প্রকাশিত হবে আর এই সংখ্যাগরিষ্ঠরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে। কিন্তু এই সংখ্যা গরিষ্ঠতাকে সংখ্যা লঘিষ্ঠতায় পরিবর্তনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে যেই নির্দেশ দিয়েছেন তা মেনে চলা একান্ত আবশ্যক। আর তা হলো, আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান বা তবলীগের কাজ। এই কাজ আমাদেরকে সর্বাবস্থায় করে যেতে হবে ইনশাআল্লাহ্ তা'আলা, আর কখনো পরিত্যাগ করা যাবে না।

এই লক্ষ্যে আমি বিশেষ করে বাংলাদেশ জামাতের প্রশাসন ও অঙ্গসংগঠনগুলোর উদ্দেশ্যে বলছি, আপনাদের কার্যক্রমে গতি সঞ্চার করুন। একটি বাস্তবধর্মী ও উৎকর্ষ কর্মসূচি হাতে নিন এবং আহমদীয়াতের তবলীগ বা সত্যের বাণী দেশের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছিয়ে দিন। আর এই কাজের সুফল তখনই আসবে যখন বাণী পৌঁছানোর পাশাপাশি আমরা নিজ নিজ কর্মের প্রতি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি দেবো। আমাদের শিক্ষা ও বাণীর সাথে আমাদের কর্মের মিল থাকলেই কেবল এটি সম্ভব হবে। অন্যথায় পৃথিবীবাসী বলবে, তুমি আমাকে কি উপদেশ দিচ্ছ? আমাকে কোন মুখে তবলীগ করছ? কোন মুখে আমাকে ইসলামের বাণী শোনাচ্ছ? আমার সামনে ইসলামের কোন্ সৌন্দর্যের বুলি আওড়াচ্ছ? কোন মুখে আমাকে বলছ যে, মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এবং পবিত্র কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী

وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ

('ওয়া 'আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়াল হাকু' বিহিম) অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসে গেছেন?

এটা বল, যেসব বিষয়ের দিকে তুমি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছ আর গর্বের সাথে বলছ, সেসব কথা তোমার মাঝে কি পরিবর্তন এনেছে? এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, শুধু আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আহ্বানকারী হলেই মানুষ শ্রেষ্ঠভাষী হয় না বরং সৎকর্মের দৃষ্টান্ত বা স্বাক্ষর রাখাও অবশ্যক। কেননা সে কথাই অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে যা কথক নিজে মেনে চলে। এক ব্যক্তি যে নিজেই মিথ্যার আশ্রয় নেয় সে কীভাবে অন্যকে সত্যের উপদেশ দিতে পারে?

কাজেই আল্লাহ্ তা'লার বাণীর প্রচার করতে হলে প্রথমে আমাদেরকে নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থার সংশোধন করতে হবে। প্রত্যেক আহমদীর নিজেকে আহমদীয়াতের দূত মনে করতে হবে। কর্ম, সেই শিক্ষা সম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয় যা আমরা প্রচার করছি। আর সেই শিক্ষা হল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ শরিয়তের শেষ গ্রন্থ পবিত্র কুরআন। যাঁর আগমনের ফলে শরিয়ত পূর্ণতা লাভ করেছে। পবিত্র কুরআনে শত শত আদেশ-নিষেধ আছে যা একজন মু'মিনকে মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর আমাদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা এর (পবিত্র কুরআনের) সকল নির্দেশ মেনে চলার চেষ্টা কর তবেই সৎকর্মশীল আখ্যা পাবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সামনে মহানবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শ রেখে এটি প্রমাণ করেছেন যে, যেসব কথা বা কাজ করার নির্দেশ তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে এর সবচেয়ে মহান মানদন্ড তোমাদের সামনে রয়েছে। নিঃসন্দেহে প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী কাজ করে থাকে। কারো কারো সামর্থ বা যোগ্যতা কম হয়ে থাকে সত্য, কিন্তু সবার জন্য এসব নির্দেশাবলী মেনে চলা এবং এ সকল কাজ করার চেষ্টা করা আবশ্যক আর খোদা তা'লা এটি বাধ্যতামূলক করেছেন ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের নির্দেশাবলী মেনে চলার সদুপদেশ দিয়েছেন। হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর আদর্শ অনুসারে জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন, **'সকল আদেশ-নিষেধ, নৈতিক শিক্ষা ও ইবাদতের ক্ষেত্রে আমাদেরকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে'**। তিনি আরো বলেন, **'মহানবী (সা.)-এর সকল**

পরাকাষ্ঠা যদি প্রতিচ্ছায়া হিসেবে অর্জন করার শক্তি আমাদের প্রকৃতিতে রাখা না হতো তাহলে কখনোই এই নির্দেশ দেয়া হতো না যে, তোমরা এই সম্মানিত রাসূলের অনুসরণ করো। কেননা আল্লাহ্ তা'লা কারো কাঁধে সাধ্যাতিত বোঝা চাপান না।

তিনি স্বয়ং বলেন,

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

('লা ইউ কাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উসআহা')।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.)-এর এই উক্তি খুবই সুন্দর যে, কুরআনের শিক্ষাই ছিল তাঁর আচরিত জীবন। কাজেই আমরা যখন আমাদের নিজেদের কর্মের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবো এবং আমাদের দুর্বলতাগুলো খতিয়ে দেখবো তখন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এ কাজগুলো করার শক্তিও কামনা করবো। আর এভাবেই আমাদের কর্ম ক্রমশঃ উন্নততর হতে থাকবে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সৎকর্মের তৌফিক দিতে থাকবেন আর নেক কর্মের গন্ডি ক্রমপ্রসারমান রাখবেন। আমাদের অবস্থা এমন হলে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আহ্বান বা তবলীগের কাজ উত্তমভাবে সম্পাদন করতে পারব। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এই কাজে বরকত দিবেন। আমাদের দাবী নিছক বুলি সর্বস্ব হবে না বরং আমরা আমাদের কথার ব্যবহারিক চিত্র হবো। আর এটি ইনশাআল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রচার বা তবলীগের কাজের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। আল্লাহ্ তা'আলা নেক কর্ম, সত্যের প্রতি আহবান এবং এই উদ্দেশ্যে নেক কর্মের পাশাপাশি এই ঘোষণাও আবশ্যক আখ্যা দিয়েছেন যে,

إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

('ইন্নানি মিনাল মুসলিমিন') অর্থাৎ, 'নিশ্চয় আমি পূর্ণ আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত'। যদি সৎকর্ম করা হয় তাহলে তা আনুগত্যের সুবাদেই করা হবে। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক, কোন সৎকর্ম তা যত উন্নতমানেরই হোক না কেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বরকত বয়ে আনবে না আর আমরা তা থেকে কল্যাণ পেতে পারি না যতক্ষণ আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য করতঃ প্রকৃতপক্ষে আনুগত্য না করব। আর যদি এ যুগের ইমামকে মান্য করে খোদার নির্দেশাবলী শিরোধার্য করতঃ এক জামাতে সম্পৃক্ত হয়ে আমরা স্বীয় দায়িত্ব পালন করি আর আল্লাহ্‌র বাণীর প্রচার করি কেবলমাত্র তাহলেই পূর্ণরূপে আনুগত্য করা হবে।

যেহেতু আমরা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশানুসারে যুগ ইমাম এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-কে তাঁর সালাম পৌঁছিয়েছি তাই আমাদের উচিত হবে, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পরিপূর্ণ আনুগত্য করা। যখন আমরা রাসূলে করীম (সা.)-এর আদেশ অনুযায়ী মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে তাঁর সালাম পৌঁছিয়েছি, তাঁর হাতে বয়'আত করেছি তাই আমাদেরকে তাঁর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করতে হবে। তবলীগের জন্য কেবল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নয় বরং একটি ব্যবস্থাপনার সাথে সংশিষ্ট হয়ে সুসংহত ও দৃঢ় পরিকল্পনা করতে হবে।

সর্বদা স্মরণ রাখবেন, ব্যক্তির সমষ্টিগত নেককর্ম জামাতকে দৃঢ়তর করে থাকে। আর যদি এই সৎকর্মশীলরা পূর্ণ আনুগত্যের চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে এক নেতার কথানুসারে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে আহ্বান করতে থাকে তাহলে পৃথিবীতে তারা একটি বিপ্লব সাধনকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে।

মহানবী (সা.) এ যুগের ঈমান আনয়নকারীদের কর্ম সম্পর্কে তাদেরকে কল্যাণের শুসংবাদ শুনিয়েছেন যারা এক জামাতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। নামসর্বস্ব জামাত বা সংগঠন অনেক আছে কিন্তু পবিত্র কুরআনের শিক্ষার উপর আমলকারী আর একহাতে বয়'আতকারী জামাত একমাত্র আহমদীয়া জামাতই। তাই প্রত্যেক আহমদীর স্বীয় এই গুরুত্বকে অনুধাবন করা একান্ত আবশ্যক। আর এ কথা জামাতের ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের জন্য ভাবার বিষয়। যদি তাঁরা আমানতের গুরুত্ব অনুধাবন না করে যার সম্পর্কে আমি গত খুতবায় উলেখ করেছি তাহলে তারাও জিজ্ঞাসিত হবে। এমন আমানত যা বহণ করতে সকলেই অস্বীকার করেছিল। কিন্তু পরিপূর্ণ মানব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) নিজের প্রতি অবিচার করে এই আমানতের বোঝা স্বীয় কাঁধে তুলে নেন আর এই আমানতই শেষ যুগে মুহাম্মদী মসীহ্‌র মান্যকারীদের প্রতি ন্যস্ত করা হয়েছে। তাঁর মান্যকারীরা যদি আমানতের ব্যাপারে সচেতন না হয় তাহলে তাদেরকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

এ দৃষ্টিকোন থেকে আমি জামাতের ব্যবস্থাপনা এবং খোদ্দাম, আনসার ও লাজনাসহ সকল অঙ্গ-সংগঠনকে বলছি, নিজেদের দায়িত্বাবলী সম্পর্কে সচেতন হোন এবং যথাযথভাবে আমানতের রক্ষণাবেক্ষণ করুন। শুধু সদস্যদের কাছে পরিপূর্ণ আনুগত্যের আশায় বসে থাকবেন না বরং নিজেদের দায়িত্বও যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করুন। যদি আমাদের চেষ্টা আরো সুসংহত ও দৃঢ় হয় তাহলে আমরা সমস্ত ব্যবস্থাপনাকে সক্রিয় করার কারণ হবো। সর্বমুখী চেষ্টা হলে দাওয়াত ইলাল্লাহ্'র কাজ আরো কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেতে পারে, যে ক্ষেত্রে এখনও অনেক ঘাটতি আছে। কোন কোন রিপোর্ট যা আমি দেখি তা থেকে মনে হয়, বাংলাদেশে যতটা কাজ হতে পারে ততটা হচ্ছে না। আশা করি এখন পর্যন্ত যত আলস্য প্রদর্শন করা হয়েছে তা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করা হবে। উন্নতি হোক বা বিরোধিতা যে সুযোগই আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে দিন না কেন তা যেন আমাদের অগ্রগতির কারণ হয় আর তা থেকে যেন আমরা শিক্ষা নেই। আজকেও বিরোধীদের পক্ষ থেকে যে বিরোধীতা হয়েছে যদি আমাদের প্রচেষ্টা নিরবচ্ছিন্ন হতো তাহলে হয়তোবা এদের মধ্য থেকে অনেকেই এখন আমাদের মাঝে বসা থাকত।

আমার দৃষ্টিতে বাংলাদেশীরা অনেক বেশি আলোকিত চিন্তাধারা ও আলোকিত মন-মানসিকতার অধিকারী এবং বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন। সত্য অনুধাবন করতে পারলে তা গ্রহণের চেষ্টা করে। এখনও বাংলাদেশে অনেক সুশিক্ষিত মানুষ আছেন যারা জামাতের বাণী'কে বুঝেন, জামাতের শিক্ষা অনুধাবন করেন। যদিও তারা আমাদের জামাতভূক্ত নন, সরাসরি জামাতের সাথে সম্পৃক্ত নন কিন্তু জামাতী শিক্ষার সৌন্দর্য অনুধাবন করেন যারফলে সর্বদা জামাতের সঙ্গ দিয়ে থাকেন। একইভাবে গ্রাম ও উপশহরে বসবাসকারী ভদ্রব্যক্তিরা জামাতের শিক্ষাকে বুঝার কারণে বিরোধীতার সময় আমাদের সঙ্গ দিয়ে থাকেন। পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশে বিরোধীতা অনেক কম এবং জামাত ভাল অবস্থানে আছে। তাই আমাদের প্রচারব্যবস্থাকে (তবলীগ) আরও সঙ্গতিপূর্ণ করা প্রয়োজন। দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র বা তবলীগের কাজকে অধিক গতিশীল করার

চেষ্টা করুন যেন আজ যেই বিরোধীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মনে হচ্ছে অচিরেই তারা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়।

এই দিনগুলো দোয়ার মাঝে অতিবাহিত করুন। নিজেদের ব্যক্তিগত অভিযোগ ও অনুযোগ পরিহার করুন। একটিমাত্র উদ্দেশ্যই সামনে থাকা উচিত যে, হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর বাণী আমাদেরকে সারা পৃথিবীতে পৌঁছাতে হবে যা প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার বাণী, যা মূলতঃ খোদা তা'আলার পানে নিয়ে যাবার বাণী। যেন আমাদের জাতি প্রকৃত অর্থে উম্মতে মুসলিমা আখ্যা পেতে পারে

সর্বদা স্মরণ রাখবেন, যখন আমাদের ঈমানে দৃঢ়তা আসবে, যখন আমাদের উদ্দেশ্য পবিত্র হবে আর আমরা যদি দৃঢ়চিত্ত হই তাহলে খোদা তা'আলা আমাদের ক্রমাগত চেষ্টার ফলে আমাদেরকে অশেষ কল্যাণে ভূষিত করতে থাকবেন। আর আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টিতে যা নির্ধারিত বিপব আমরাও তার অংশ হয়ে যাব। আলাহ্ তা'লা আপনাদের সবাইকে সেই সুযোগ দিন।

পারস্পরিক ভালবাসা এবং ভার্তৃত্ববোধের পরিবেশ গড়ে তোলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কর্তৃক বর্ণিত জলসার উদ্দ্যেশ্যাবলীর অন্তর্ভূক্ত। তাই উত্তম আদর্শ প্রদর্শন করতঃ প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার পরিবেশ গড়ে তুলুন।

কেবল এখানে অবস্থানকালেই নয় বরং যখন নিজ নিজ গৃহে ফিরে যাবেন, সেখানেও প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার পরিবেশ সর্বদা বজায় রাখুন। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন। জলসার অবশিষ্ট কার্যক্রম কল্যাণজনকভাবে সমাপ্ত হোক আর আপনারা সবাই মঙ্গলজনকভাবে ও নিরাপদে নিজ নিজ গৃহে ফিরে যান এটিই কাম্য।

অনুবাদঃ মাহমুদ আহমদ সুমন
এবং বাংলা ডেস্ক, লন্ডন

জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশে ৭ বছর মেয়াদী শাহেদ কোর্সে ৬ষ্ঠ ব্যাচে ভর্তিচ্ছুদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। আগামী ০৪ জুন ২০১১ এর মধ্যে দরখাস্ত সেক্রেটারী বোর্ড অব গভর্ণরস জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ। ৪নং বকশী বাজার বরাবর পৌঁছতে হবে। আগামী ১৪, ১৫, ১৬ এবং ১৭ জুন ২০১১ তারিখ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ্। আবেদনকারী ছাত্রদেরকে অবশ্যই ১৪ জুন ২০১১ তারিখ বিকাল ৫-০০টার পূর্বে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের অফিসে পৌঁছে রিপোর্ট করতে হবে।

আবেদনকারীর যোগ্যতা নিম্নরূপ হবে ঃ

১. এস. এস. সি/এইচ. এস. সি-তে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং গড়ে নূন্যতম "বি" গ্রেড থাকতে হবে।

২. এ বছর এইচ. এস. সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরাও আবেদন করতে পারবেন। তবে এস. এস. সি -তে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে।

৩. ভালো স্বাস্থ্য ও মেডিকেল চেকআপে উত্তীর্ণ হতে হবে।

৪. সর্বোচ্চ বয়স সীমা, এস. এস. সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৭ এবং এইচ. এস. সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৯ বছর।

৫. ওয়াকফে নও ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে অগ্রাধিকার পাবে।

৬. কুরআন শুদ্ধভাবে পড়া অবশ্যই জানতে হবে, ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞানে ভাল হতে হবে এবং জামাতি বই পড়ার অভ্যাস থাকতে হবে।

৭. জীবন উৎসর্গকারী হতে হবে।

৮. ভাল আহমদী তাকওয়াশীল এবং জামাতি কাজে অংশগ্রহণকারী হতে হবে।

৯. আরবী, উর্দু ও ইংরেজী ভাল জানা থাকলে অগ্রাধিকার পাবে।

১০. বয়আত গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিন বৎসর অতিক্রান্ত হতে হবে।

১১. ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও এপ্টিচিউড টেষ্টে ভাল ফলাফল করতে হবে।

১২. আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী অবশ্যই থাকতে হবে–অন্যথায় আবেদন পত্র গ্রহণ যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। আবেদনকারীর সঠিক ঠিকানা এবং বাড়ির অথবা জামাতের ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

(ক) নিজের নাম (খ) পিতার নাম (গ) মাতার নাম (ঘ) জন্ম তারিখ এবং বয়আতকারী হলে বয়আতের তারিখ (ঙ) শিক্ষাগত যোগ্যতা (চ) স্বহস্তে লিখিত আবেদন পত্র হতে হবে (ছ) স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্টের সুপারিশ থাকতে হবে (জ) জামাতি মজলিসি চাঁদা পরিশোধ মর্মে স্থানীয় সেক্রেটারী মাল/নাযেম মাল এর সার্টিফিকেট থাকতে হবে (ঝ) ওয়াকফে নও হলে নম্বর উল্লেখ করতে হবে (ঞ) অন্য কোন বিশেষ যোগ্যতা থাকলে উল্লেখ করতে পারেন (ট) জামাতের এমন দুইজন বিশেষ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হবে যিনি আপনার সম্বন্ধে ভাল করে জানেন (ঠ) জামাতের কোন বুযুর্গ (মৃত বা জীবত) এর সাথে যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক থেকে থাকে তবে তা উল্লেখ করুন।

বিঃ দ্রঃ প্রত্যেক স্থানীয় জামাতে জুমুআর নামাযে একাধিক দিন সার্কুলারটি এলান এবং নোটিস বোর্ডে প্রদর্শনের অনুরোধ করছি। প্রয়োজনে যোগাযোগ করার মোবাইল নাম্বার ০১১৯১৩৬৩৪১৮ অথবা ০১৯২২০২৪৫৯১।

সেক্রেটারী
বোর্ড অভ গভর্ণরস
জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ
৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ বাংলাদেশ

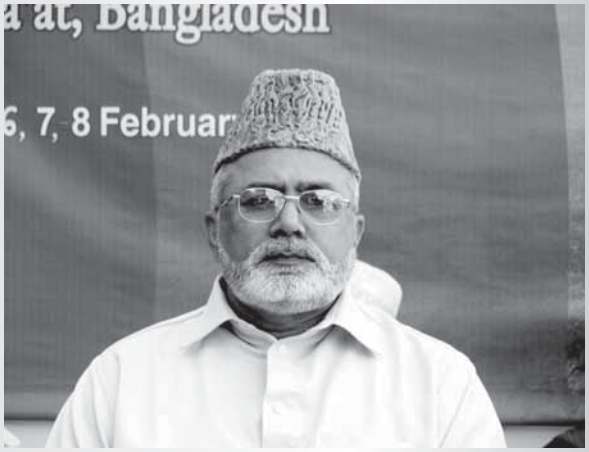

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি
মুফতি মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব প্রদত্ত বাংলাদেশের ৮৭তম সালানা জলসার বক্তব্য

"ভারসাম্যপূর্ণ সুখী পারিবারিক জীবন"

তাশাহুদ, তাআ'ব্বুয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর তিনি বলেন– আপনারা শুনেছেন আমার বক্তব্যের বিষয় হচ্ছে বর্তমান সমাজে ভারসাম্যপূর্ণ সুখী পারিবারিক জীবন। বাস্তবতা হচ্ছে কোন পরিবারে যদি স্বামী এবং স্ত্রীদের মধ্যে সম্পর্ক ভাল হয় তো এর ফলে তাদের সন্তান সন্ততির মাঝেও উত্তম প্রভাব পড়ে। তাদের স্বভাব চরিত্রও ভাল হয়। স্বামী স্ত্রীর মাঝে যদি ভাল সম্পর্ক থাকে তাহলে এর ফলে উভয়ের আত্মীয় স্বজনের মধ্যেও ভাল ও সুসম্পর্কের সৃষ্টি হয়।

যদি স্বামী স্ত্রীর মাঝে সুসম্পর্ক বিদ্যমান থাকে তাহলে তাদের সন্তান সন্ততিও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয় এবং দুই পরিবারের মাঝে সুসম্পর্ক বিদ্যমান থাকে তবেই আমরা একটি উত্তম সমাজ ব্যবস্থা দেখতে পাব। দাম্পত্য জীবন আরম্ভ করার উদ্দেশ্যে হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, কোন মেয়েকে বিবাহের ক্ষেত্রে চারটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়। কতিপয় লোক তাদের ধন সম্পদের প্রতি লক্ষ্য করে তাকে বিবাহ করেন। কেউ তার বংশ মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিবাহ করে। কেউ তার সৌন্দর্য্যের প্রতি লক্ষ রেখে তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আর কতক লোক তার ধার্মিকতাকে দৃষ্টিতে রেখে বিবাহ করেন। তিনি (সা.) বলেন, আমি তোমাদেরকে এই চারটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে নিষেধ করি না। কিন্তু আমি তোমাদের এই উপদেশ দিচ্ছি তোমরা ধার্মিকতাকে প্রাধান্য দাও। যদি স্ত্রী ধার্মিক হয় তাহলে তার সুন্দর না হওয়া, সম্পদশালী না হওয়া, উচু বংশের না হওয়া সংসারে কোন প্রকারের ক্ষতির কারন হবেনা। এভাবে তিনি (সা.) বলেছেন, যদি কেউ তোমার বোনের বা মেয়ের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করতে চায় তাহলে তুমি দু'টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখ। একটি হচ্ছে তার ধার্মিকতা ও অপরটি হচ্ছে তার চারিত্রিক গুনাবলি। যদি এ দুটি উত্তম হয় তাহলে তার সাথে বিবাহ দাও। এক ব্যক্তির মেয়ের জন্য হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) দু'জন ছেলের বিবাহের প্রস্তাব দেন। আর পরামর্শ স্বরূপ দু'জন পাত্রের মধ্যে যে গরিব তাকে তিনি (আ.) বেশী পছন্দ করেন। উপদেশ স্বরূপ বললেন, মিয়া সাহেব যদি আপনার মেয়ে ধার্মিক ও ভাগ্যবতী হয় তাহলে তার কল্যাণে সেই গরীবও ধনী হয়ে যাবে। যদি তার মাঝে ধার্মিকতা না থাকে আর সে কোন বড় লোকের ঘরেও যায় তাহলে সেই ধনী ব্যক্তিও গরীব হয়ে যাবে। এ কারণে বিবাহ শাদীতে ধার্মিকতা ও উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টি দিবে।

সুতরাং মুসলমানদের বিবাহের এলানের সময় নসিহত করার উদ্দেশ্যে হযরত রাসূল করীম (সা.) যে আয়াত সমূহ নির্বাচিত করেছেন। আমি বন্ধুদের সেই আয়াত ও তার অনুবাদ শুনাচ্ছি, বিবাহ একটি মানবীয় সম্পর্ক। সে মু'মিন হোক বা কাফের। সে ভাল হোক বা মন্দ হোক এটা প্রত্যেকের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সতরাং আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, **ইয়া আই-ইউহান নাসুত্বাকু রাব্বাকুম** এখানে আল্লাহ্ তাআলা এটা বলেননি যে, হে মুসলমানগণ বা হে ঈমানদারগণ। বরং তিনি বলেছেন হে মানব সকল, হে লোক সকল, নিজেদের হৃদয়ে খোদাভীতির সৃষ্টি কর। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক খোদাভীতির সাথে আরম্ভ করা উচিত। সেই খোদাকে ভয় কর যিনি তোমাদের একই আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন। তা থেকেই তিনি তার সঙ্গী ও জোড়া সৃষ্টি করেছেন। আর এদের মধ্য থেকে অসংখ্য মহিলা পুরুষ সৃষ্টি করে তাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আয়াতের এই অংশটির প্রতি গুরত্বসহকারে দৃষ্টি দেয়া অত্যন্ত জরুরী। এটি আরবী ভাষার একটি প্রবাদ বাক্য যে, অমুক বস্তু থেকে অমুক বস্তুর সৃষ্টি করা হয়েছে অর্থাৎ অমুক বস্তুর বৈশিষ্ট দিয়ে অমুক বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে। এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলছেন, হে মানব সকল এই বিবাহের মাধ্যমে তোমাদের একটি নতুন জীবন আরম্ভ হচ্ছে। তুমি এবং তোমার স্ত্রীই নয় বরং পৃথিবীর সবাই একই গুণাবলী নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছ। একই ধরণের কামনা বাসনা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে জন্ম লাভ করেছ।

একই ধরণের আবেগ অনুভূতি নিয়ে জন্মেছ। সুতরাং যখন নিজের স্ত্রী ও অন্যদের সাথে ব্যবহার কর তখন চিন্তা কর তুমি নিজের বেলায় এ রকম মুহূর্তে কি ব্যবহার আশা কর। যেভাবে তুমি চাও যেন তোমার আশা আকাঙ্খাকে মূল্যায়ন করা হোক অনুরূপ ভাবে তোমার স্ত্রীও চায় যেন তার আশা আকাঙ্খার মূল্যায়ন করা হয়। যেভাবে তুমি চাও যে, তোমার স্ত্রী ও তার আত্মীয় স্বজন তোমাকে ও তোমার আত্মীয় স্বজনকে সম্মান করুক। অনুরূপ ভাবে তোমার স্ত্রীও চায় যেন তুমি এবং তোমার আত্মীয় স্বজনও তাকে এবং তার আত্মীয় স্বজনকে সম্মান কর। এজন্য বলা হয়েছে একে অপরের সাথে আচার ব্যবহারের ব্যাপারে খোদার ভয়কে হৃদয়ে লালন করবে। যে খোদার নামের দোহাই দিয়ে অন্যকে

নিজের কথা মানতে বাধ্য কর সেই খোদার ভয় সর্বদা হৃদয়ে লালন কর। নিজ আত্মীয় স্বজনের অধিকারের ব্যপারেও খোদাভীতির প্রতি দৃষ্টি রেখ। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, **ইন্নাল্লাহা আলাই কুমুর রাকিবা,** অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা সর্বদা তোমাদের তত্বাবধান করছেন। তোমরা চালাকীর মাধ্যমে মানুষকে ধোকা দিতে পার । মানুষ থেকে আড়াল করতে পার। কিন্তু খোদাকে ধোকা দিতে পারবে না। খোদা থেকে নিজেকে আড়াল করতে পারবে না। যে ভাবে চোরকে যদি ছোট একটি শিশুও দেখে ফেলে তাহলে সে চুরি করে না। তাহলে যে খোদা সর্বদা তোমাকে দেখছেন কিভাবে তুমি তার নির্দেশের অমান্য করবে, আল্লাহ্ বলেন, হে ঈমানদারগণ তোমরা তোমাদের হৃদয়ে খোদার ভয় সৃষ্টি কর। যখন তোমরা নতুন জীবন আরম্ভ কর তো সর্বদা সহজ সরল কথা বল। সরল সহজ কথা বললে এর ফলাফল কি হবে **ইউসলেহ লাকুম আমালাকুম** এর ফল এটা হবে যে, যদি তোমাদের কাজে কোন ত্রুটি থাকে তাহলে তিনি তা সংশোধন করে দিবেন। **ওয়া ইয়াগফিরলাকুম যূনুবাকুম** অর্থাৎ তোমাদের কাজে কর্মে যদি কোন ভুল থাকে তাহলে আল্লাহ্ তাআলা তা গোপন রাখবেন। এর মন্দ পরিনাম থেকে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে রক্ষা করবেন।

এ উপদেশে আল্লাহ্ তাআলা সফলতার রহস্য বর্ণণা করে দিয়েছেন। এটা বলেন নি যে তোমাদের চালাকী তোমাদের কাজকে সংশোধন করে দিবে। তোমাদের মিথ্যা বলা তোমাদের প্রতারণা তোমাদের কাজকে সংশোধন করে দিবে। বরং বলেছেন, যে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের অনুসরণ করবে সে মহা সম্মান ও মহা সফলতা লাভ করবে। সুতরাং যে স্বামী নিজের স্ত্রীকে এবং যে স্ত্রী নিজের স্বামীকে ধোকা দেয় সেই ঘরে কখনো শান্তি বিরাজ করতে পারে না। আল্লাহ্ বলেন, হে ঈমানদারগণ নিজেদের হৃদয়ে খোদার ভয় সৃষ্টি কর। আর সর্বদা চিন্তা কর আমি আগত দিনের জন্য কি করেছি। সর্বদা নিজের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা কর। সেটা এই জগতেই হোক বা পরকালের জন্য। আল্লাহ্ বলেন, তোমরা হৃদয়ে খোদার ভয়ের সৃষ্টি কর। কেননা তোমরা যে কাজই কর আল্লাহ্ তাআলা সে সম্পর্কে অবগত। এ আয়াত সমূহে আল্লাহ্ তাআলা বার বার তাকওয়া ও খোদাভীতি অবলম্বনের কথা বলেছেন।

এ আয়াত সমূহ হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিবাহের খুতবায় পাঠ করার জন্য নির্বাচিত করেছেন। এক ব্যক্তি এক বুযূর্গকে জিজ্ঞাসা করেছেন আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে যে বার বার তাকওয়ার কথা বলেছেন আসলে তাকওয়া কি জিনিস? তিনি বলেন এটার দৃষ্টান্ত এরূপ মনে কর, যদি তুমি কোন জঙ্গল পার হয়ে ওপারে যেতে চাও। আর সেই জঙ্গল কাটাযুক্ত গাছ দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে তাহলে তুমি কি করবে। প্রশ্নকারী উত্তর দিল প্রত্যেক কাটা থেকে নিজের কাপড়কে বাঁচিয়ে অতিক্রম করব। যেন বাম পাশের বা ডান পাশের কোন কাঁটায় আমার জামা আটকে না যায়। সেই বুযর্গ বলেন, এটাই হচ্ছে তাকওয়া। পৃথিবীতে প্রতিটি পদক্ষেপে নিজেকে বাঁচিয়ে চল।

কোন ক্ষেত্রে যেন আল্লাহ্ তাআলার আদেশ অমান্যকারী বলে সাব্যস্ত না হও। এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, **ওয়ালা হুন্না মিছলু ল্লাযি আলা হুন্না বিল মারুফ।** অর্থাৎ যেভাবে সামাজিক রীতিনীতি মোতাবেক স্বামীর অধিকার রয়েছে স্ত্রীর উপর। অনুরূপ স্ত্রীরও অধিকার রয়েছে স্বামীর উপর। এক সাহাবী প্রশ্ন করেছেন, হে রাসূলুল্লাহ আমাদের উপর আমাদের স্ত্রীর কি রকম অধিকার রয়েছে। তিনি (সা.) বলেন, তোমরা নিজেরা যা খাও নিজের স্ত্রীকেও তাই খাওয়াও। যা তুমি নিজে পরিধান কর তাই নিজের স্ত্রীকেও পরিধান করাও। কিন্তু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে কাউকে না কাউকে তত্বাবধায়ক মনোনীত করতে হয়। এই ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্যই বলা হয়েছে **"লির রিজালে আলা হুন্না দারাযা** অর্থাৎ স্বামীদের স্ত্রীদের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এই প্রাধান্যতা ঘরের ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য দেয়া হয়েছে। অন্যথায় আশা আকাংখা ও কামনা বাসনার দিক থেকে দুজন এক সমান। কিন্তু পুরুষকে মর্যাদা দেয়ার কথা বলে এই নসিহত করেছেন যে, **ওয়াল্লাহু আযীযুন হাকীম** অর্থাৎ হে স্বামীগণ যেভাবে তোমরা স্ত্রীদের উপর প্রাধান্য রাখ অনুরূপভাবে আল্লাহ্ও তোমাদের উপর প্রাধান্য রাখেন। এ জন্য সংসার পরিচালনা করতে গিয়ে স্ত্রীদের প্রতি অবিচার করতে গিয়ে এটা মনে রেখ খোদা তোমাদের থেকে অধিক ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং কুরআন করীম এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রতিটি সূরার প্রথমে বিসমিল্লাহ হির রাহমানির রাহীম- আয়াত রেখেছেন। এই বাক্যে রহমান ও রহীম দুটি শব্দের মাঝে ব্যাকরনের দিক থেকে সামান্য পার্থক্য রয়েছে তা না হলে দু'টি শব্দের উৎপত্তি স্থল হচ্ছে রহম অর্থাৎ দয়া। আর এদিকে দৃষ্টি দেয়ার জন্য শরিয়ত ব্যবস্থা করেছে। বলা হয়েছে সকাল থেকে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত প্রতিটি কাজের প্রথমে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পাঠ কর। প্রতিটি কাজ তাকে যেন বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়া যে দয়ার যে শিক্ষা সেটা যেন সে ভুলে না যায়। কেন না রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, **"তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ** অর্থাৎ হে মুসলমানগণ আল্লাহ্র গুণাবলী নিজেদের মাঝে সৃষ্টি কর। এ কারণে আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমের প্রতিটি সূরার প্রারম্ভে তার মৌলিক দুটি গুণাবলীর কথা বলেছেন যে, আমি রহমান ও রহীম। বিশেষ ভাবে স্বামী স্ত্রীর দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করানোর জন্য একটি আয়াতে স্পষ্টভাবে এটা বর্ণণা করেছেন।

আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, **ওয়া মিন আয়াতেহী আন খালাকালাকুম আনফুসেকুম আযওয়াজান,** অর্থাৎ এটা আল্লাহ্ তাআলার নিদর্শন যে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই জোড়া সৃষ্টি করেছেন। স্বামী ও স্ত্রীর কামনা বাসনা আবেগ অনুভূতি দুটিই এক। আল্লাহ্ বলে, **লে তাফকুনু ইলাইহা,** অর্থাৎ হে স্বামীগণ তোমরা এদিক সেদিক শান্তি অন্বেষন করার পরিবর্তে একে অপরের মাঝে শান্তি অন্বেষণ কর। যে স্বামীরা নিজেদের স্ত্রীকে ছেড়ে অন্য স্থানে শান্তি অন্বেষণ করে আর যে সকল স্ত্রী তাদের স্বামীদের বাদ দিয়ে অন্যের মাঝে শান্তি অন্বেষণ করে, তাদের ঘর এই জগতেই জাহান্নাম-সদৃশ হয়ে যায়। তাদের পরস্পরের মাঝে ঝগড়া বিবাদ আরম্ভ হয়ে যায়। মা বাবার প্রত্যেক দিনের ঝগড়া ঝাটি দেখে সন্তানরাও ঘর থেকে বিমুখ হয়ে যায়। তারাও ঘরের পরিবর্তে বাহিরে শান্তি অন্বেষণ করে। যার প্রেক্ষিতে তারা অপরাধীদের হাতে চলে যায়। আর সেই সন্তানও ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ্ বলেন, **ওয়া জায়ালা বাইনাকুম মুয়াদ্দাতাও ওয়া রাহমা** অর্থাৎ হে স্বামী ও স্ত্রীগণ আল্লাহ্ তোমাদের মাঝে ভালবাসা ও দয়ার আবেগের সৃষ্টি করেছেন। যদি তোমরা চাও যে. তোমাদের ঘর শান্তির নীড়ে পরিণত হোক তাহলে একে অপরের সাথে ভালবাসা ও আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ কর। অন্য আরেক

স্থানে বলেন, **আশেরু হুন্না বিল মা' রুফে**। অর্থাৎ হে স্বামীগণ তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার কর। প্রত্যেকের মাঝেই কোন না কোন দূর্বলতা থেকে থাকে। একারনে বলেছেন **ফা ইন কারেতুবুহুন্না**। অর্থাৎ যদি তোমাদের স্ত্রীগণ কোন দূর্বলতার কারনে বা কোন দোষের কারণে তোমাদের পছন্দ না হয়। এমতাবস্থায় তার দূর্বলতাকে গোপন কর। তার দোষক্রটিকে ঢেকে রাখ। কেননা তুমি ফেরেশতা নও। যদি তার মাঝে দু'টি দোষ থাকে তাহলে নিজের প্রতি দৃষ্টি দাও তোমার মাঝেও দোষ রয়েছে। যদি তোমার স্ত্রীর মাঝে দূর্বলতা থেকে থাকে তাহলে সেটার প্রতি দৃষ্টি দেয়ার পরিবর্তে তার মাঝে গুণাবলীকে অন্বেষণ কর। আল্লাহ্ বলেন **ফা আসয়া আন তাকরাউ শায়য়াও ওয়া ইয়াজ আলাল্লাহু ফিহি খায়রান কাসিরা** অর্থাৎ হতে পারে তোমরা কোন বস্তুকে অপছন্দ করছ কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা হয়ত সেটার মাঝে অনেক বেশি কল্যাণ রেখে দিয়েছেন।

এ পরিপ্রেক্ষিতে আমি একটি ঘটনা শুনাচ্ছি। বর্ণিত আছে যে, হযরত ঈসা (আ.) তাঁর হাওয়ারীদের সাথে বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় কুকুরের লাশ পড়েছিল। অত্যন্ত দুর্গন্ধ নির্গত হচ্ছিল। হাওয়ারীরা নিজেদের নাকে কাপড় দিয়ে বলতে লাগল খুব বেশী দুর্গন্ধ আসছে। হযরত ঈসা (আ.) বললেন, কিন্তু দেখ তার দাঁত কত সুন্দর। এ বাক্য দ্বারা হযরত ঈসা (আ.) এটা বলতে চেয়েছেন, তার দোষ-ক্রটির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে বরং তার গুণাবলীর দিকে দৃষ্টি দাও। অন্যস্থানে আল্লাহ্ তাআলা এ বিষয়টি বর্ণনা করার জন্য একটি উত্তম উদাহরণ উদ্ধৃত করেছেন। **'ইন্না লেবাছুল্লাকুম ওয়া আনতুম লেবাছুল্লাহুন্না'** অর্থাৎ হে স্বামীগণ তোমাদের স্ত্রী তোমাদের পোশাক আর হে স্ত্রীগণ তোমাদের স্বামী তোমাদের পোশাক। এই উত্তম দৃষ্টান্তের ব্যাপারে চিন্তা করুন। পোশাক কাকে বলে? আর পোশাক কি কাজে আসে? পোশাক পরিধান করলে মানুষকে সুন্দর দেখায়। পোশাক মানুষের সত্ত্বাকে সুন্দর করে উপস্থাপন করে। প্রথমত এখানে এটা বর্ণনা করা হয়েছে যে, স্বামীগণ স্ত্রীদের গুনাবলী এবং স্ত্রীগণ যেন স্বামীদের গুণাবলী বর্ণনা করেন। কাপড়ের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পোশাক শরীরের দূর্বলতা ও দোষক্রটি সমূহকে ঢেকে রাখে ও মানুষের নগ্নতাকে প্রকাশ হতে দেয় না। এতে বলা হচ্ছে যদি স্ত্রীর মাঝে কোন দূর্বলতা বা দোষ ক্রটি থাকে তাহলে পোশাকের ন্যায় স্বামীগণ যেন তা ঢেকে রাখে। কারও সামনে প্রকাশ না করে। অনুরূপভাবে স্বামীর মাঝে যদি কোন দোষ ক্রটি থাকে বা দুর্বলতা থাকে তাহলে স্ত্রীগণও যেন তাঁর দোষক্রটি ঢেকে রাখে। কারো সামনে প্রকাশ না করে।

সুতরাং হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেন, **'খাইরুকুম খাইরুকুম লে আহলেহি'** অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে, যে তার স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার করে। **'ওয়া আনা খাইরুকুম লে আহলি'** অর্থাৎ হে সাহাবাগণ আমি তোমাদের সবার মধ্য থেকে নিজের স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করি। কোন মানুষ আমার থেকে বেশি তাঁর স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার করতে পারে না। তিনি (সা.) নিজের যে কোন বিষয়ে নিজ স্ত্রীদের সাথে পরামর্শ করতেন। আর যদি তাঁদের পরামর্শ গ্রহণীয় হত তাহলে, তা তিনি গ্রহণ করতেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনা, তিনি (সা.) কাফেরদের সমস্ত শর্ত শান্তির খাতিরে মেনে নিয়েছেন। সাহাবাগণ এতে নিজেদের অপমানিত মনে করেছিল।

সেই সাহাবাগণ অনেক যুদ্ধে যাঁরা মক্কার কুরাইশদের সর্দারকে পরাজিত করেছিল। তাঁরা এটা মনে করেছিল যে, আমরা কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা রাখি অথচ প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা নিচু হয়ে তাঁদের সাথে চুক্তি করেছি। এটা চিন্তা করে তাঁরা দুঃখে অত্যন্ত মনমরা হয়ে গেল। তিনি (সা.) বললেন, উঠ আর নিজেদের কুরবানীসমূহ জবাই কর। তাঁরা দুঃখ-কষ্টে এত মর্মাহত হয়েছিলেন যে, রাসূল করীম (সা.) তিন বার তাঁদের কুরবানী করার হুকুম দেয়া সত্ত্বেও একজন সাহাবীও কুরবানী করতে প্রস্তুত হলেন না। ঐ অবস্থায় হযরত রাসূল করীম (সা.) নিজের তাঁবুতে ফিরে গেলেন। এবং নিজের স্ত্রীকে বললেন, সারা জীবনে প্রথমবার এরূপ হয়েছে যে, আমি তিনবার সাহাবাদের কুরবানী করতে বলেছি আর তারা তাতে আমল করেনি। তাঁর (সা.) স্ত্রী উত্তর দিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল আপনার সাহাবাগণ অবাধ্য নয়। বরং দুঃখের কারনে তাঁদের উপর এই অবস্থা বিরাজমান। আপনি আপনার কুরবানী করুন। আর এরপর দেখুন সাহাবাগণ কিভাবে আপনার সুন্নতের উপর আমল করে। এ পরামর্শক্রমে হযরত রাসূল করীম (সা.) নিজের তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসলেন এবং নিজের পশু কুরবানী করলেন। এ দৃশ্য দেখে সেসকল সাহাবা যাঁরা শোকে দুঃখে বসেছিল আর তাঁরা বুঝছিল না যে তাঁদের কি করা উচিত। তাঁরাই নিজেদের পশু কুরবানী করার জন্য একজন আর এক জনের আগে এভাবে দৌড়াচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল কোথাও তাঁরা না একে অপরকে জবাই করে ফেলে।

নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনে স্ত্রীদের পরামর্শকে কখনও তুচ্ছ মনে করবেন না। বরং নিজেদের সমপর্যায়ের মনে করবেন। এক সফরে পুরুষ ও মহিলা উভয় সে সফরে ছিল। আর আনন্দের সাথে গাইতে গাইতে উটকে দ্রুত দৌড়াচ্ছিল। এতে তিনি (সা.) সাহাবাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, **রিফ কাম বিল কাওয়ারীর রিফকাম বিল কাওয়ারীর** অর্থাৎ সাবধানে, সাবধানে চালাও কেননা এর উপর কাঁচ রয়েছে। যেভাবে আজকাল প্রবাদ বাক্য রয়েছে Glass with care অর্থাৎ সাবধান কাঁচের জিনিস, এটা সেই কথার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা। কেউ তাঁর (সা.) পবিত্র সহধর্মিণী হযরত আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি (সা.) যখন বাসায় আসতেন তো তিনি কি করতেন। তিনি উত্তর দিলেন রাসূল (সা.) যখন ঘরে আসেন তো **কানা কি সেহনাতি আহলেহী** অর্থাৎ ! তিনি তার স্ত্রীর কাজে সাহায্য করেন। স্ত্রীরা ঘরে যে কাজ করে তিনি তাদের সাথে মিলে কাজ করতেন। যখন নামাযের সময় হত তো তিনি দ্রুত কাজ কাম ছেড়ে বাজামাত নামাযের জন্য মসজিদে চলে যেতেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন হযরত রাসূল পাক (সা.) অত্যন্ত নরম স্বভাবের ছিলেন। তিনি (সা.) কখনো নিজের চেহারায় রাগের বহি:প্রকাশ করেন নি। সর্বদা হাস্যবদনে থাকতেন। যদি কখনো নিজের স্ত্রীদের কোন ভুল হত তো কখনো তিনি (সা.) নিজের স্ত্রীদের উপর হাত উঠাতেন না। যদি কখনো তিনি (সা.) রাতে দেরী করে বাসায় আসতেন তো স্ত্রীদের সজাগ করাতেন না। চুপ চাপ ঘরে প্রবেশ করতেন আর যে খাবার থাকত অর্থাৎ দুধ হলেও তা পান করে নিতেন কিন্তু কাউকে সজাগ করতেন না। তিনি (সা.) বলেন, হে আমার সাহাবাগণ, স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার কর। মহিলাদেরকে অবশ্যই পাজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পাজরের হাড় শব্দের ব্যাপারে চিন্তা করুন। পাজরের হাড় আসলে কি আর কি আকৃতির ন্যায় হয়ে থাকে। এই পাজরের হাড়ের মাঝে

মানুষের সবচেয়ে বেশী মূল্যবান বস্তু নিরাপদে রয়েছে। বলা হয়ে থাকে পাজরের হাড়ের মাঝে অনেক বাকা টেরা থাকে যদি সেটাকে সোজা করার চেষ্টা কর তাহলে তা ভেঙ্গে যাবে। আর যদি এটাকে ছেড়ে দাও তাহলে তা বাকাই থেকে যাবে আর এই বাকা অবস্থা থেকেই কল্যাণ উঠাতে হবে। এই বাক্যে বুঝানো হয়েছে যদি তোমাদের স্ত্রীদের মাঝে পাজরের হাড়ের ন্যায় কোন বক্রতা কোন দূর্বলতা বা কোন কমতি থাকে আর যদি সেটাকে সোজা করতে যাও তাহলে তা ভেঙ্গে যাবে। তাঁর বাকা অবস্থায় তা থেকে কল্যাণ অন্বেষণ কর কেন না এতেই তার সৌন্দর্য্য নিহিত। এই বাক্যে স্ত্রীদের পাজরের হাড্ডি বলে এই নসিহত করেছে যে, যে ভাবে পাজরের হাড় মানুষের হৃদয়কে পরিবেষ্টন করে হেফাজত করে থাকে অনুরূপভাবে তোমরাও নিজেদের স্বামীর সামনে বিনয়ী হও, তাদের হেফাজত কর, তাদের অবাধ্যতা কর না।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর সাহাবী আব্দুল করিম শিয়ালকোটি (রা.) একদা রাগান্বিত হয়ে নিজের স্ত্রীকে মারলেন এবং নিজের স্ত্রীর প্রতি কঠোর আচরণ করেন। আল্লাহ্ তাআলা এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে হযরত মসীহ মাউওদ (আ.)-কে এলহাম করেন, এই পদ্ধতি সঠিক নয়। অর্থাৎ স্ত্রীদের সাথে কঠোর ব্যবহার করা সঠিক পদ্ধতি নয়। মুসলমানদের নেতা আব্দুল করিম কে যেন এই কাজ থেকে বিরত রাখা হয়। এই এলহামে আল্লাহ্ তাআলা মৌলভী আব্দুল করিম শিয়ালকোটি (রা.) সাহেবকে মুসলমানদের নেতা বলেও আখ্যায়িত করেছেন তার দোষও বর্ণনা করেছেন এই পদ্ধতি সঠিক নয়। মুসলমানদের নেতা আব্দুল করিমকে এই কাজ থেকে যেন বাধা দেয়া হয়। অর্থাৎ হে মসীহ মাওউদের জামাত, স্ত্রীদের সাথে নরম ব্যবহার কর কেননা এটাই সমস্ত নেকীর মুকুট। হযরত রাসূল করিম (সা.) মহিলাদের ব্যপারে এত উদ্বিগ্ন ছিলেন যে যখন তিনি (সা.)-এর মৃত্যু শয্যায় ছিলেন তখনও তিনি (সা.) সাহাবাদের বার বার এ নসিহত করেছেন যে স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। এক ব্যক্তি রসূল কারীম (সা.) কে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল আমার ঘরে বিভিন্ন ধরণের সমস্যা রয়েছে হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেন, তুমি বাহির থেকে যখনই ঘরে প্রবেশ কর তো ঘরে কেউ থাকুক বা না থাকুক তুমি উচ্চ স্বরে বলো, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। তোমার ঘরের সমস্যা সমূহ দূরীভূত হয়ে যাবে। এই উপদেশে রাসূল করীম (সা.) ঘরের সমস্ত লোকদেরকে খোদা তাআলার রহমত ও বরকত এবং নিরাপত্তা নিজেদের উপর অবতীর্ণ করার দোয়া শিখিয়েছেন। পবিত্র কুরআন এদিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে; **ইযা দাখালতু বুয়ুতান** অর্থাৎ হে মুসলমানগণ যখন তোমরা নিজেদের ঘরে প্রবেশ কর **ফাসাল্লেমু আলা আনফুসেকুম** অর্থাৎ তোমরা ঘরের অধিবাসিদের উদ্দেশ্যে সালাম প্রেরণ কর এবং তাদের সকলের জন্য খোদার দরবারে নিরাপত্তার দোয়া কর। হযরত রাসূলপাক (সা.) উদ্দেশ্য করে বলেন, **ওয়া মুর আহলাকা বিসসালাতে** অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা.) নিজের পরিবারের সদস্যদের নামাযের জন্য তাকিদ দিতে থাক **ওয়াসতাবের আলাইহা** অর্থাৎ নিজের পরিবারের সদস্যদের ও স্ত্রী সন্তানদের নামাযের নসিহত করার ব্যাপারে কখনো বিরত হয়ো না, তাদের নসিহত করার ব্যাপারে কখনো শিথিলতা প্রদর্শন কর না বরং সর্বদা নসিহত করতে থাক। এই বাক্যে আল্লাহ্ তাআলা রাসূল করীম (সা.)-এর মাধ্যমে উদাহরণ দিয়ে এটা বুঝাতে চেয়েছেন, নিজের স্ত্রী সন্তানদের ধর্মের কথা বলতে থাক। আর কেবল উপদেশের মাঝে সীমাবদ্ধ রেখনা। এ নসিহত যেন বাস্তব রূপ লাভ করে এ জন্য খোদার দরবারে ঝুকে থেক ও দোয়া করতে থাক।

সুতরাং তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাআলার বান্দা তারাই যারা সর্বদা খোদার দরবারে দোয়া করেন আর আবেদন করে, **রাব্বানা ওয়া হাবলানা মিন আজওয়াযেনা ওয়া যুররিয়াতেনা কুররাতা আযুনিন** আর্থাৎ হে প্রভু প্রতিপালক আমাদের স্ত্রী সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সর্বদা চোখের স্নিগ্ধতা দান কর। এই বাক্যে স্ত্রী সন্তানদের পক্ষ থেকে স্নিগ্ধতা দান কর। এই দোয়ার মাঝে ইহকাল ও পরকালের সকল প্রকার উপকরণ সন্নিবেশিত রয়েছে। কেননা আমরা অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত নই। আমরা জানিনা কোন কথা, কোন বস্তু, আমাদের জন্য কষ্টের কারণ হতে পারে। আল্লাহ্ তায়ালা জানেন কোন কথা, কোন বিষয় আমাদের জন্য কষ্টের কারন। তাই সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌র নিকট সোপর্দ করে দেয়া উচিত। একারণে এই দোয়ার অর্থ এই দাড়ায় যে, হে আল্লাহ্ যদি আমাদের স্ত্রী বা সন্তানদের পক্ষ থেকে কোন প্রকার কষ্টের কারন হয়ে থাকে তাহলে তা তুমি দূর করে দাও। আমরা জানিনা আমাদের স্ত্রী সন্তানদের পক্ষ থেকে কোন কোন বিষয় চোখের স্নিগ্ধতার কারণ হবে তুমি আমাদেরকে তা দান কর যা আমাদের চোখের স্নিগ্ধতার কারন হবে। **ওয়াজ আলনা লে মুত্তাকিনা ইমামা** অর্থাৎ হে আল্লাহ্ আমাদের তাকওয়াশীলগণের ইমাম বানাও।

ইমাম কাকে বলে। যার পদাঙ্ক অনুসরনে লোকেরা চলে। আর সে তাদের আগে আগে থাকে। এ প্রবন্ধে বলা হয়েছে হে আমাদের খোদা আমাদের স্ত্রী ও সন্তান যারা আমাদের পিছনে আসবে তারা যেন মন্দ স্বভাবের না হয় বরং তাকওয়াশীল হয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তাআলা এই সুসংবাদ দিয়েছেন যে, আপনার প্রত্যেকটি ছেলে মেয়ে, নেক ধার্মীক ও মুত্তাকী হবে। তিনি (আ.) বলেন তা সত্ত্বেও আমি প্রতিটি নামাযে ছেলে মেয়েদের ধার্মীক ও নেক হওয়ার জন্য দোয়া করে থাকি।

তিনি (আ.) তাঁর এক পংতিতে আল্লাহ্‌কে সম্বোধন করে দোয়া করেন, হে আল্লাহ যখন আমি এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিব তো আমি যেন আমার সন্তানদের তাকওয়াশীল দেখতে পাই। আমার চোখের স্নিগ্ধতার কারন হয় এবং হৃদয়ের প্রশান্তির কারণ হয়। বন্ধুগণ আমাদের মাঝে এমনও হয়ত কেউ আছেন যাকে তার সন্তানদের ধার্মিক হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। আমাদের মাঝে হয়ত বেশীর ভাগ এরূপ রয়েছেন যাদের সন্তানগণের ব্যাপারে পূর্বে বা পরে পূণ্যবান হওয়ার ব্যাপারে সুসংবাদ প্রদান করেন নি। কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখুন খোদার নবী মসীহ (আ.)-কে ধারাবাহিক ভাবে তার সন্তানদের নেক হওয়ার ব্যাপারে সুসংবাদ দেয়া সত্ত্বেও কিভাবে দোয়া করেছেন। তাহলে চিন্তা করে দেখুন নিজেদের সন্তানদের নেক হওয়ার ব্যাপারে আমাদের কিরূপ আহাজারীর সাথে দোয়া করা উচিত।

অনুবাদ : **জাফর আহমদ**
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

In the name of Allah, Most Gracious, Ever Merciful

Press Desk

Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

LONDON, 28 March 2011

PRESS RELEASE

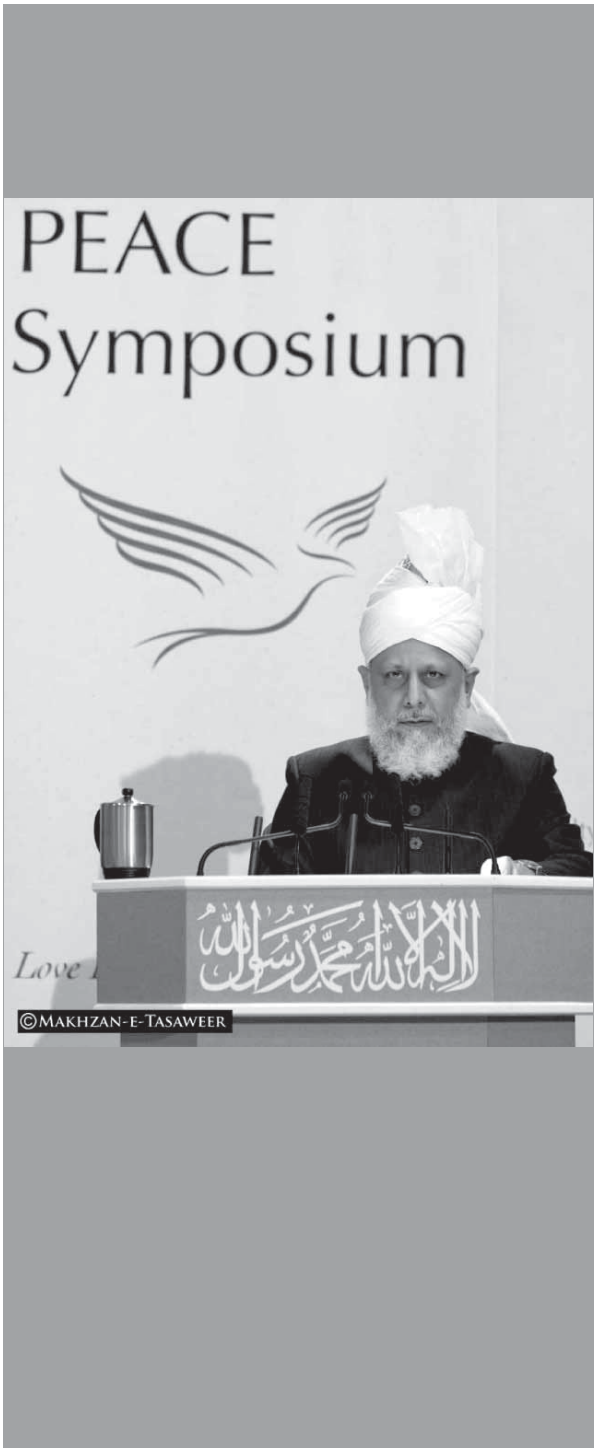

Muslim leader praises British spirit of tolerance

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad gives keynote address at 8th Annual Peace Symposium

On Saturday 26th March 2011 the Head of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, spoke at length upon the issue of achieving global peace whilst delivering the keynote address at the 8th Annual Peace Symposium of the Ahmadiyya Muslim Jamaat UK, held at the Baitul Futuh Mosque in Morden. The event attracted an audience of over 1,000, including Government Ministers, MPs, senior Foreign Embassy officials and members of the British armed forces.

During the event the 2nd Ahmadiyya Peace Prize was presented to Abdul Sattar Eidhi, the founder of the Eidhi Foundation, in recognition of his continued efforts in terms of social welfare and humanitarian relief. The award was accepted by Mr Eidhi via a video message due to him being otherwise engaged in facilitating the relief efforts for the Japan earthquake victims.

In his welcome address, Rafiq Ahmad Hayat, the President of the Ahmadiyya Muslim Jamaat UK, said that the Ahmadiyya community was leading the way in removing misconceptions about Islam. It was a religion that advocated peace, understanding and thus the Ahmadiyya Muslim Jamaat promoted integration and dialogue at all levels.

Siobhain McDonagh, MP for Mitcham and Morden, quoted a verse of the Holy Qur'an which advocates justice and fair dealing in all circumstances. She said that justice and tolerance were fundamental to a peaceful society.

Lord Eric Avebury who last year won the inaugural Ahmadiyya Peace Prize for his continued efforts to promote human rights across the world said that the root cause of all the recent conflict in the world was intolerance. He said that existing UN mechanisms required reform and that he felt that the Ahmadiyya Muslim Jamaat was very well placed to play a key role in that process.

Ed Davey, MP for Surbiton and Kingston and Minister for Employment Relations, paid tribute to the Ahmadiyya

Muslim Jamaat for 'championing the cause of peace of peace worldwide'. He said that the Jamaat's motto of 'Love for All, Hatred for None' was a truly inspiring message.

Dominic Grieve QC, MP for Beaconsfield and the Attorney General, said that in the past year the world had witnessed many examples of intolerance for example attacks on Ahmadi Muslims and on Christians. The world faced constant challenges and the biggest challenge was ensuring that each person was free to exercise his own conscience and free will. If this principle was observed then people in conflict ridden countries could come to have the same rights that are taken for granted in countries such as the UK.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, the world Head of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, then presented the second annual Ahmadiyya Peace Prize to Abdul Sattar Eidhi. Accepting the award via a video message Mr Eidhi said:

"I do not believe in differences. I believe in humanity. I never ask those in need what religion they practice, I just see that they are human and that they need my help. The best means for achieving peace is humanity; we all must have love for our fellow mankind."

The recipient went onto thank the Ahmadiyya Muslim Jamaat for honouring him with the prize and further congratulating the Jamaat on its continued service to humanity and disaster relief throughout the world.

During his keynote address Hadhrat Mirza Masroor Ahmad spoke about the causes underpinning the current political turmoil sweeping through many Arab and North African countries; about Britain's long term pursuit of tolerance and justice; the failure of the United Nations to fulfil its mandate, the restrictions placed upon Muslims in certain countries and the continued peaceful reaction of the Ahmadiyya Muslim Jamaat in the face of the bitterest persecution.

Commenting upon recent developments and unrest in North Africa and the Middle East, His Holiness said that the fundamental basis for peace was truth and justice and failure to heed this would lead to dissent. He said:

"In short, the disorder taking place these days in the world, whether on a national or international scale, is based upon just one factor – and that is a complete lack of justice which is causing anxiety and restlessness to develop. The question arises that how can the present situation in the world be resolved. It is through the development of a relationship with God and exhibiting the truth."

His Holiness commented upon the role of the United Nations in international relations. He said:

"Now if we assess and examine the United Nations then we see that in its history apart from a few occasions it has never fulfilled the requirements of justice and therefore has failed to fulfil its role properly. This is because factors such as materialism, the forming of blocs and alliances, vested interests, personal enmity and grudges have all proved obstacles to acting with due justice. And so the United Nations has not been able to establish peace because it has not displayed true impartiality and fair dealing."

His Holiness also spoke of how certain countries had chosen to restrict or prohibit certain harmless practices or traditions. However the British Government had not followed this path. His Holiness said this was due to the tolerant nature of the British people. He said:

"The UK is one of those countries that has become home to people of many different nations, cultures and religions of the world. Although in comparison to many larger countries the UK is relatively small in size, the broad mindedness of its people has made it like a world in itself… Due to the open-minded and progressive nature of the UK public there is a positive influence here which means that whichever political party comes into power, it does not toy with the sentiments of religious followers when discussing religious issues. It is my prayer that this desire for justice remains their guiding principle."

His Holiness concluded his address by speaking about the persecution faced by the Ahmadiyya Muslim Jamaat. He said that in May last year 86 Ahmadi Muslims were brutally martyred whilst offering their Friday prayers. Similarly in February this year 3 Ahmadi Muslims in Indonesia were martyred in the most barbaric manner. His Holiness said that despite such cruelties and injustices the Ahmadiyya Muslim Jamaat never responded with anything other than with peace. He said:

"We have always implemented the teaching of Islam that you should never take the law into your own hands and always keep the best interests of your country in view and never create disorder, because this is a requirement of true love for your country. Wherever in the world Ahmadis reside, no matter which country they originate from, be they Asian, or African, or Arab or European or American, their behaviour is always the same. For the sake of attaining Allah's pleasure they always steer clear of all forms of disorder. And this is the conduct that one day will not only save the world from anarchy, in fact it will be its guarantor for world peace."

Following the conclusion of the event, His Holiness met the assembled guests and held an audience with members of the British Armed Forces and also with members of the assembled press.

22 Deer Park Road, London, SW19 3TL UK

২৮ মার্চ, ২০১১
প্রেস রিলিজ

বৃটেনের সহিষ্ণুতার-নীতির প্রশংসায় মুসলিম নেতা

৮ম বার্ষিক শান্তি আলোচনা সভায় হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ মূল ভাষণ দান করেন

অনুবাদ : **মোহাম্মদ ফজলুর রহমান**

বিগত ২৬ মার্চ, ২০১১ইং রোজ শনিবার নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ যুক্তরাজ্যের মর্ডেনে অবস্থিত বাইতুল ফুতুহ মসজিদে অনুষ্ঠিত ৮ম বার্ষিক শান্তি আলোচনা সভায় মূল ভাষণ দান কালে বিশ্ব-শান্তি অর্জনের বিষয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দান করেন। সরকারী মন্ত্রীবর্গ, সংসদ সদস্য, পররাষ্ট্র দূতাবাসের উর্ধতন কর্মকর্তা ও বৃটিশ সেনাবাহিনীর সদস্য সহ এ অনুষ্ঠান হাজারো শ্রোতাকে আকর্ষণ করে।

অনুষ্ঠান চলাকালে ঈধি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল সাত্তার ঈধিকে তার সামাজিক উন্নয়ন ও লোকহিতকামী ত্রান-প্রচেষ্টার স্বীকৃতি স্বরূপ ২য় আহমদীয়া শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হয়। জাপানের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ত্রান সামগ্রী বিতরণের কাজে অন্যত্র ব্যস্ত থাকা জনাব ঈধি একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে এ পুরস্কার গ্রহণ করেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট জনাব রফিক আহমদ হায়াত তার প্রদত্ত স্বাগত ভাষণে বলেন যে, ইসলাম সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণাদি নিরসনে আহমদীয়া সম্প্রদায় দিশারীর ভূমিকা পালন করে আসছে। ইসলাম হচ্ছে শান্তি ও পারস্পরিক বোঝা পড়ার স্বপক্ষের ধর্ম এবং এ কারণে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সকল পর্যায়ে সংহতি ও সংলাপকে উৎসাহিত করে।

মিশাম ও মর্ডেনের এম. পি. মি: সিওভাইন ম্যাকডোনাগ পবিত্র কুরআন থেকে একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দেন, যা সর্বক্ষেত্রে ন্যায় বিচার ও সদাচরণের কথা বলে তিনি বলেন যে, ন্যায়বিচার ও সহিষ্ণুতাই হচ্ছে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজের মৌলিক বিষয়।

লর্ড এরিখ এডবারি, যিনি সারা বিশ্বে মানবাধিকার উন্নয়নে তার লাগাতার প্রচেষ্টার কারণে গত বছর প্রারম্ভিক আহমদীয়া শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন, বলেন যে, সাম্প্রতিককালে সংঘটিত বিশ্বের সব সংঘাতের মূল কারণ হচ্ছে অসহিষ্ণুতা। তিনি বলেন যে, জাতিসংঘের বর্তমান কার্যসাধন ব্যবস্থার পূনর্গঠন প্রয়োজন এবং তিনি এটা অনুভব করেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সেই প্রক্রিয়ায় মূল ভূমিকা পালনে খুবই সুপ্রতিষ্ঠিত।

সার্বিটন এবং কিংষ্টনের এম, পি এবং এমপ্লায়মেন্ট রিলেশন্স-এর মন্ত্রী এড ডেভি আহমদীয়া জামা'তের বিশ্বব্যাপী শান্তি রক্ষার প্রচেষ্টা চালানোর কাজের পশংসা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন যে, জামা'তটির আদর্শবাণী "ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো পরে" প্রকৃতপক্ষেই একটি অনুপ্রেরণার বাণী।

বীকন্সফিল্ডের এম. পি এবং এটার্নি জেনারেল মি: ডমিনিক গ্রীড বলেন যে, বিগত একটি বছরে অসহিষ্ণুতার অনেক উদাহরণ বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে, যেমন–আহমদী মুসলমান ও খৃষ্টানদের উপর হামলা। বিশ্ব অবিরতভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীতাসমূহের মোকাবিলা করছে আর সবচে' বড় অভিযোগ হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তির তার নিজ বিবেক ও মুক্ত চিন্তার অনুশীলন করতে পারার নিশ্চয়তা দান করা। যদি এই নীতি পালন করা যেতো, তাহলে সংঘাতময় দেশ সমূহেও বৃটেনের মত সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা নেয়া যেতো।

অত:পর নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মসিলম জামা'তের প্রধান হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ জনাব আব্দুল ছাত্তার ঈধিকে দ্বিতীয় বার্ষিক আহমদীয়া শান্তি পুরস্কার প্রদান করেন। একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে জনাব ঈধি এ পুরস্কার গ্রহণ করার পর বলেন, "আমি ভেদাভেদ এ বিশ্বাস করি

না, আমি মানবতায় বিশ্বাস করি। যারা অভাবী, তাদেরকে আমি কখনো জিজ্ঞেস করি না, তারা কোন্ ধর্মের অনুসারী, আমি শুধু এটুকুই দেখি যে, তারা মানুষ এবং আমার সাহায্য তাদের প্রয়োজন। মানবতাবোধই হচ্ছে শান্তিলাভের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়, আমাদের সবারই প্রতিবেশী মানবগোষ্ঠীর প্রতি ভালবাসা থাকতে হবে"।

পুরস্কার প্রদান করে সম্মানিত করার জন্যে পুরস্কার গ্রহিতা আহমদীয়া জামা'তকে একাধিকবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং লাগাতারভাবে বিশ্বব্যাপী মানবতার সেবা ও দুর্যোগে সাহায্য বিতরণের জন্যে জামা'তকে অভিন্দন জানান।

মূল ভাষণ দানকালে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ অনেক আরব দেশ ও উত্তর-আফ্রিকার দেশসমূহে বিস্তৃত রাজনৈতিক বিক্ষোভের কারণ সমূহ, বৃটেনের দীর্ঘ মেয়াদী সহিষ্ণুতা ও ন্যায়বিচারের অনুসরণ, জাতিসমূহের অধিকার সংরক্ষণে জাতিসংঘের ব্যর্থতা, কতিপয় মুসলমান দেশের উপর আরোপিত বাধা-নিষেধ এবং চরম বেদনাদায়ক নির্যাতনের মোকাবিলায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের লাগাতার শান্তিপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার কথা ব্যক্ত করেন।

উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক উন্নয়ন ও অশান্তির বিষয়ে মন্তব্য করে হুযূর (আই.) বলেন যে, সত্য ও ন্যায়বিচারই হচ্ছে শান্তির মৌলিক ভিত্তি এবং এসব বিষয়ে মনযোগ দিতে ব্যর্থ হলে তা মতবিরোধ সৃষ্টি করবে। তিনি (আই.) বলেন, "সংক্ষেপে, সাম্প্রতিককালে বিশ্বে যে অশান্তি বিরাজ করছে, তা জাতিগত অথবা আন্তর্জাতিক-যে মাত্রারই হোক, তার একটি মাত্র মূল কারণ রয়েছে, আর তা হচ্ছে, ন্যায় বিচারের পূর্ণ অভাব, যা অস্থিরতা ও অশান্তি বৃদ্ধির কারণ। প্রশ্ন উঠে যে, বিশ্বের বর্তমান অবস্থার সমাধান কিভাবে করা যেতে পারে? এর জবাব হলো, কেবলমাত্র খোদার সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ও সত্য প্রদর্শনের মাধ্যমেই তা সম্ভব।"

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে হুযূর (আই.) জাতিসংঘের ভূমিকার উপর মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, "এখন যদি আমরা জাতিসংঘের মূল্যায়ণ ও পরীক্ষা করি তাহলে দেখতে পাই যে, এর ইতিহাসে অল্প কিছু ক্ষেত্র ব্যতীত ইহা কখনো ন্যায় বিচারের প্রয়োজনীয়তাকে পূর্ণ না করার কারণে যথাযথ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, জড়বাদ, সংঘ ও জোট গঠন, কায়েমী স্বার্থসমূহ, ব্যক্তিগত শত্রুতা ও ঈর্ষার মত উপদান সমূহের সবগুলোতেই যথাযথ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়নি, কারণ, ইহা প্রকৃত পক্ষপাতহীনতা ও সদাচারণ প্রদর্শন করেনি"।

কতিপয় দেশ কিভাবে কিছু অক্ষতিকর রীতি ও মতবাদের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ অথবা নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পছন্দ করেছে, সে বিষয়ে হুযূর কথা বলেন। যাহোক, বৃটিশ সরকার সেপথ অনুসরণ করেনি। হুযূর (আই.) বলেন যে, এটা বৃটেনের জনগণের সহিষ্ণু-প্রকৃতির কারণেই সম্ভব হয়েছে। তিনি (আই.) বলেন, "যুক্তরাজ্য সেসব দেশের অন্যতম, যেগুলো বিশ্বের বিভিন্ন জাতি, রাষ্ট্র ও ধর্মের মানুষের বাসভূমিতে পরিণত হয়েছে। যদিও অনেক বড় বড় দেশের তুলনায় আকারের দিক থেকে যুক্তরাজ্য ছোট, কিন্তু এর লোকদের মানসিক প্রশস্ততা একে নিজের মধ্যে একটি বিশ্বের রূপ দান করেছে। যুক্তরাজ্যের জনগণের খোলা মনমানসিকতা ও প্রগতিশীল প্রকৃতির কারণে এখানে ইতিবাচক প্রভাব বিরাজ করে, যার অর্থ এই যে, যে রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় আসুক, ধর্মীয় বিষয়াদি আলোচনার সময় সেটা মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে খেলা করে না। আমি দোয়া করি, ন্যায়বিচারের এই আকাঙ্ক্ষা তাদের পথ প্রদর্শক হয়ে বিরাজ করুক।

বক্তৃতার উপসংহারে হুযূর (আই.) আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের উপর অত্যাচারের ঘটনার বিবরণ দেন। তিনি বলেন যে, গত বছর মে মাসে ৮৬ জন আহমদী মুসলমানকে জুমুআর নামায আদায়ের সময় বর্বরোচিতভাবে শহীদ করা হয়। একইভাবে এ বছর ফেব্রুয়ারী মাসে ইন্দোনেশিয়ায় অত্যন্ত পাশবিক কায়দায় ৩ জনকে শহীদ করা হয়। হুযূর (আই.) বলেন যে, এসব নিষ্ঠুরতা ও অবিচার সত্বেও আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত শান্তিপূর্ণ উপায় ব্যতিত কখনোই অন্য কোন মাধ্যমে এসবের জবাব দেয়নি। তিনি বলেন, "আমরা সর্বদাই ইসলামের এ শিক্ষা কার্যে পরিণত করেছি যে, তোমরা আইনকে নিজ হাতে তুলে নিবেনা এবং সর্বদা তোমাদের স্বদেশের সর্বোচ্চ স্বার্থসমূহকে বজায় রাখার বিষয়টি স্মরণ রাখবে এবং কখনোই অশান্তি সৃষ্টি করবে না, কারন দেশের প্রতি সত্যকারের ভালবাসার জন্য এটা জরুরী। বিশ্বের যেখানেই আহমদীরা বাস করুক, এটা কোন বিষয়ই নয় যে, তারা এশিয়া, আফ্রিকা, আরব, ইউরোপ অথবা আমেরিকার যে কোন দেশেরই আদিবাসিন্দা হোক না কেন, সর্বদা তাদের আচরণ একই রকম থাকবে। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তারা সর্বদাই অশান্তিকে এড়িয়ে চলবে এবং এটা সেই আচরণ, যা একদিন বিশ্বকে অরাজকতা থেকে শুধু রক্ষাই করবে না, প্রকৃতপক্ষে এটা বিশ্ব শান্তির জামিনদার হবে"।

অনুষ্ঠান শেষে হুযূর (আই.) উপস্থিত অভ্যাগতদের সাথে সাক্ষাত করে তাদেরকে বৃটিশ সেনাবাহিনীর সদস্য ও সংবাদপত্রের সদস্যদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন।

২২, ডিয়ার পার্ক রোড, লন্ডন, এস ডব্লিউ-১৯, ৩ টি এল, ইউ, কে

নৈতিক অবক্ষয় রোধে ইসলামি শিক্ষা

মওলানা বশিরুর রহমান, মুরুব্বী সিলসিলাহ

মানুষ যখন খোদা তাআলা প্রদত্ত বিচার বুদ্ধিতে পরিপক্ক হয়ে তা দ্বারা সৎ ও অসৎ বা সুকর্ম ও কুকর্মের মাঝে পার্থক্য করতে পারে সেটিকে নৈতিকতা বলে, আর এক সময় পর্যন্ত সুপথ বর্জনে তার মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং কুকর্ম করলে সে মনে মনে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়। এ পর্যায়টি মানুষকে অন্য সকল প্রাণী থেকে উন্নততর করে। আর এ কারণেই মানুষকে আশরাফুল মখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআন নৈতিক গুনের এ অবস্থাকে এভাবে বর্ণনা করে।

'আমি ঐ আত্মার শপথ করছি, যা প্রত্যেক অপকর্ম ও সীমা লংঘনে নিজেকে তিরস্কার করে'

(সূরা কিয়ামা:৩)

এটা মানুষকে প্রবৃত্তির তাড়নায় বলগাহীন উটের ন্যায় চলা এবং চুতস্মপদ জন্তুর মত জীবন যাপন করা থেকে নিবৃত্ত রাখে আর এ প্রেরণা জোগায় যে, মানুষের মাধ্যমে উত্তম অবস্থা ও উত্তম চরিত্রের প্রকাশ হউক এবং মানব জীবনের কোন কাজ যেন কোন প্রকার স্বেচ্ছাচারিতার কারণে না হয়, প্রবৃত্তি বা স্বভাবের উত্তেজনা ও বাসনা যেন যুক্তি ও জ্ঞানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। উপরন্ত সে যেন নিজ আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভের যোগ্যতা অর্জন করে আর স্বীয় জন্মকে অহেতুক ও অনর্থক মনে না করে বরং ঐশী তত্ত্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে তার মধ্যে সত্যিকার নৈতিক চরিত্র গড়ে উঠে।

নীতিগতভাবে নৈতিকতার শিক্ষাটি দুভাগে বিভক্ত। প্রথমটি হচ্ছে নতুন প্রজন্ম অর্থাৎ সন্তানদের ইসলামি শিক্ষার আলোকে গড়ে তুলা দ্বিতীয়: বয়স্কদের ইসলামী শিক্ষার আলোকে গড়া।

উভয় শ্রেণীকে দৃষ্টিপটে রেখে ইসলাম নৈতিকতা বা উত্তম চরিত্র গঠনের নির্দেশ দিয়েছে। যেমন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন,

'হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে আগুন থেকে রক্ষা কর।' (সূরা তাহরীম:৭)

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

'এবং তুমি (সর্বপ্রথম) নিজ নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদের সতর্ক কর' (সূরা শূআরা:২১৫)

এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের জন্য এটি অবশ্য করণীয় নির্ধারণ করেছেন যে, তাঁরা সদা জাগ্রত থাকবে এবং কেবল নিজেরাই শুধু সৎ কর্মশীল হবে না বরং নিজেদের স্ত্রী, পুত্র-কন্যা এবং পরিবারের অন্যান্য আত্মীয় সন্তানদের প্রতিও দৃষ্টি রাখবে এবং ধর্মীয় ও চারিত্রিক বিষয়েও উত্তম তরবীয়তের ব্যবস্থা করে তাদেরকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করবে। 'আহল' (পরিবার) শব্দে ঘরের চাকরও অন্তর্ভূক্ত। আপন চাকর-চাকরানীদের চরিত্র ও স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখাও মুসলমানদের উপর ফরয বা অবশ্য-করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে। শুধু এ কারণেও নয় যে, তাদের চাকরও খোদার বান্দা বরং এ কারণেও যে, দিনরাত মেলামেশার ফলে ঘরের শিশু এবং অন্যান্যদের উপরও চাকর-বাকরদের স্বভাব-চরিত্রের যথেষ্ট প্রভাব পড়ে থাকে। এভাবে এ আয়াতটি এক বিরাট সূক্ষ্ম এবং রূপক অর্থ বহন করে। কারণ এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মু'মিনগণকে তাদের স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, তাদের সাথে বসবাসকারী আপনজন এবং ঘরের চাকর-বাকর ইত্যাদি সবার জন্য অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক নির্ধারণ করেছেন।

নৈতিক অবক্ষয় রোধে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই ইসলাম কতক জরুরী ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

প্রথমত: নৈতিক গুণাবলি সম্পন্ন আদর্শ বান জাতি গঠনের জন্য আদর্শ মায়ের প্রয়োজন। এ বিষয়টি বর্তমানে সর্ব সমাজেই স্বীকৃত। আর এ জন্যই আল্লাহর প্রিয় হাবীব মহানবী (সা.) আমাদেরকে জোড়ালো উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন,

স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে মানুষ চারটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখে, কেউ তার সৌন্দর্য আর কেউ ধন-সম্পদ, কেউ তার বংশ বা আভিজাত্য, কেউ তার ধর্মপরায়ণতার প্রতি দৃষ্টি রাখে। সুতরাং (হে মুসলমানগণ) তোমরা ধর্মপরায়ণতাকে প্রাধান্য দাও নচেৎ তোমাদের হাত ধূলিমাখা থাকবে। (বুখারী)

হুযূর (সা.)-এর এ হাদীসটি খুবই পরিষ্কার এতে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। যে সকল লোকেরা হুযূর (সা.)-এর এই মহান শিক্ষাকে অগণ্য করে স্ত্রী নির্বাচন করেছে তাদের হাত সর্বদা ধূলিমাখা থেকেছে অর্থাৎ তারা সর্বদা ক্ষতির মধ্যে পতিত হয়েছে, তাদের সংসার সুখের হয় না, সন্তানাদিও তেমন ধর্মভীরু হয় না। অপরদিকে আল্লাহর পবিত্র বান্দাগণের মায়েদের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিলে আমরা দেখতে পাব তাদের সবাই ধর্মপরায়ণা মহিলা ছিলেন। পুণ্যবান সন্তান-সন্ততি লাভের জন্য আঁ হযরত (সা.)-এর উপরোক্ত হাদীস স্বর্নালী অক্ষরে লেখে রাখার যোগ্য এবং প্রত্যেকের নিজের কল্যাণে তা পালন করা অবশ্য কর্তব্য। সন্তানের ওপর মায়ের প্রভাব যে কত ব্যাপক তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কামরুল আম্বিয়া হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.)-এর কথায় বলতে গেলে বলতে হয়- *পূণ্যবান সন্তান-সন্ততি লাভ করতে পূণ্যবতী মা থেকে বড় আর কোন যন্ত্র এ পর্যন্ত আবিস্কৃত হয় নি। সুতরাং পুণ্যবান সন্তান-সন্ততি পাওয়ার জন্য বিবাহপ্রার্থী যুবকদের পুণ্যবতী যুবতীর অন্বেষণে থাকা প্রয়োজন। মোটকথা ইসলাম পুণ্যবতী মহিলাকে বিয়ে করার তাগিদ দিয়ে ঐ সময় থেকে পুণ্যবান সন্তান-সন্ততি লাভের পরিকল্পনা করতে বলেছে, যখন সন্তানের কোন নাম নিশানাও থাকে না। পন্ডিতগণ বলেছেন, যে হাত দোলনা দোলায় ঐ হাত দেশ শাসন করে। এ কথার দ্বারা মায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়। একজন ধর্মপরায়ণা সুশিক্ষিতা মাতা সঠিক পরিচালনা দ্বারা তার সন্তানকে আদর্শ ছেলে মেয়ে রূপে গড়ে তুলতে পারেন। সন্তানের জীবনে ও নিজ পরিবারে এনে দিতে পারেন অনাবিল সুখ। আর মাতার এহেন দায় দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে আঁ-হযরত (সা.)-ও বলেছেন-* **আল্ জান্নাতো তাহতা আকদামেল উম্মাহাতিকুম** *অর্থাৎ তোমাদের মায়ের পায়ের নীচে বেহেশত। কেউ কেউ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলতে চান যে, এ*

হাদীসে মায়ের সেবার কথা বলা হয়েছে। যদি মায়ের সেবা করলেই বেহেশত লাভ হয় তাহলে অপরাধী যত অপরাধই করুক না কেন মায়ের সেবা করলেই জান্নাত লাভ করবে। আসল কথা এই যে, 'মায়ের পায়ের নীচে' অর্থাৎ মায়ের কঠোর অনুশাসন, শিক্ষা ও স্নেহ মমতায় সন্তান পুণ্যবান হতে পারে আর এর ফলশ্রুতিতে তার জন্য এ দুনিয়াতেও জান্নাত এবং পরকালেও। একজন মাকেও অবশ্যই জান্নাতী হতে হবে তা না হলে সন্তান যে জান্নাতী হবে তা আশা করাই বৃথা। তাই একজন ধর্মপরায়ণা মায়ের প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

দাম্পত্য জীবনঃ ইসলামী শিক্ষার আলোকে নৈতিক চরিত্র সম্পন্ন মানুষ সৃষ্টির জন্য কেবল যে, স্বামী-স্ত্রী নিজেদের চিন্তা-ধারণাকেই পবিত্র রাখবে তা না বরং নিজেদের বিশেষ সম্পর্কের সময় এ বিশেষ দোয়া ও পাঠের নির্দেশ রয়েছে,

হে আমাদের খোদা! যাঁর হাতে সকল প্রকার মঙ্গল ও অমঙ্গলের চাবি রয়েছে, তুমি না শুধু আমাদেরকে শয়তানী ধ্যান ধারণা ও শয়তানী কার্যকলাপ থেকে রক্ষা কর বরং যে সন্তান তুমি আমাদেরকে দান করবে তাকেও শয়তানী প্রভাব থেকে নিরাপদ রাখবে।"

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন- "যে স্বামী স্ত্রী নিজেদের মিলনকালে পবিত্র উদ্দেশ্য নিয়ে এই দোয়া করে এবং এই মিলনের ফলে তাদের যদি কোন সন্তান লাভ হয়, তবে আল্লাহ তাআলা তাদের সন্তানকে শয়তানের স্পর্শ থেকে রক্ষা করবেন। এছাড়া যে কোন সন্তান বাইরের কুপ্রভাবের ফলে শয়তানের শিষ্য হয়ে যায়।" এটা জানা কথা, স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সময়টা যৌন কামনার অসাধারণ ভাবাবেগের সময়। তাই এটা নিঃসন্দেহ যে পুরুষ ও নারী এরূপ সময়েও খোদাকে স্মরণ করে এবং তাঁর কাছে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা কামনা করে তাদের সন্তানেরা অবশ্যই তাদের অসাধারণ পুণ্য ও এই দোয়া থেকে অংশ পেয়ে থাকে।

সুতরাং, যারা নিজেদের সন্তানদের নৈতিক চরিত্র সম্পন্ন দেখতে চান তাদের জন্য এই দোয়াটিও এক সূক্ষ্ম ও সহজ উপায় যা আমাদের প্রিয় নবী (সা.) বর্ণনা করেছেন। এটা শুধু উত্তম ধর্মবিশ্বাসের দাবী নয় বরং পৃথিবীর মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা এই কথার সাক্ষ্য বহন করে যে, নর-নারীর যৌন-মিলনের সময়ের ভাবাবেগ দ্বারা সন্তান অবশ্যই প্রভাবিত হয়ে থাকে।

এ সম্পর্কে এ যুগের প্রতিশ্রুত যুগ ইমাম বলেন, সন্তানের আকাঙ্ক্ষা করাকে "আল্লাহ তাআলা এভাবে কুরআনে বর্ণনা করেছেন-

'হে খোদা তাআলা! আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের থেকে চোখের স্নিগ্ধতা দান করো (সূরা ফুরকান: ৭৫) আর এটা তখনই সহজসাধ্য হতে পারে যে, তারা দুষ্কৃতকারী ও অযথা জীবন যাপনকারী না হয় এবং খোদাকে প্রত্যেক পরিস্থিতিতে প্রাধান্যদানকারী হয়। আর পরে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, সন্তান যদি পুণ্যবান ও খোদা ভীরু হয় তাহলে তো সে তাদের ইমামই হবে। এতে বরং বলা চলে যে, খোদা ভীরু হওয়ার জন্যও দোয়া রয়েছে" (মলফূযাত:২য় খন্ড, ৩৭৩ পৃষ্ঠা)

ভাল নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ পাওয়ার লক্ষ্যে ইসলাম দাম্পত্য জীবনকে যেভাবে অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে তাতে একজন মুসলমান পুরুষ আহলে কিতাবের একজন মহিলাকে বিয়ে করতে পারে কিন্তু অবশ্যই তাকে সতী সাধ্বী হতে হবে (সূরা মায়েদা:৬)। আরও অন্যত্র বলা হয়েছে, একজন মু'মিন বাদী একজন মুশরিক স্বাধীন মহিলা থেকে উত্তম (সূরা বাকারা: ২২২) এছাড়া এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, একজন মু'মিন দাস মুশরিক স্বাধীন পুরুষ অপেক্ষা উত্তম (সূরা বাকারা: ২২২)। একজন মুসলমান মহিলাকে অমুসলমান পুরুষের সাথে বিয়ে দেয়া পবিত্র কুরআন অনুযায়ী নিষিদ্ধ (সূরা মুমতাহনা-১১) এ আয়াতগুলোর আলোকে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের একই মন মানসিকতা ও সমঝোতা প্রয়োজন। এক দেহ এক মন ও একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী না হলে স্বামী স্ত্রীর জীবন মধুময় হতে পারে না। আর এথেকে যে সন্তান রূপ ফসল লাভ হয় তা উৎকৃষ্ট হতে পারে না। স্বামী-স্ত্রীর জীবন মধুময় না হওয়ার কারণে বহু সন্তান সন্ততি যে নষ্ট হয়েছে এর ভুরি ভুরি প্রমাণ আমাদের চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। উপরন্ত ইসলাম বিয়ে শাদীর ব্যাপারে যতগুলো দিক নির্দেশনা দিয়েছে সেগুলোও আমাদের মেনে চলা উচিত। তা হলেই আগত প্রজন্মে ভাল নৈতিক গুণের বিকাশ সম্ভব।

প্রসংঙ্গত এখানে উল্লেখ করতে চাই, নৈতিক অবক্ষয় রোধে কুরআনের এ শিক্ষাগুলোর কারণে, আর যেহেতু আহমদী মুসলমানদেরকে অ-আহমদী ওলামাগণ কুফরীর ফতওয়া দিয়েছেন এবং অ-আহমদী মুসলমানগণ তাদের কথাই মানেন, তাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আহমদী পুরুষগণকে অ-আহমদী মেয়ের সাথে এবং আহমদী মেয়েকে অ-আহমদী পুরুষের সাথে বিয়ে দিতে নিষেধ করেছেন [ফাতাওয়ায়ে মসীহে মাওউদ (আ.) ১৪৫ পৃষ্ঠা]। কোন আহমদী ছেলে ক্ষেত্র বিশেষে অ-আহমদী মেয়েকে নেযামের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খলীফায়ে ওয়াক্তের অনুমতি নিয়ে বিয়ে করতে পারে। কিন্তু একজন আহমদী মেয়েকে কোনক্রমেই অ-আহমদী ছেলের সাথে বিয়ে দেয়া যাবে না (খুতবা: হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী, তারিখ ২৭-১২-১৯২০)। উপরোক্ত ব্যবস্থা কোন ঘৃণা প্রকাশার্থে বা কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য নয়। শুধুমাত্র সঠিক ইসলামী তা'লীম ও তরবীয়ত এবং চিন্তা চেতনাকে অম্লান ও অক্ষুণ্ন রাখার জন্য এবং ভবিষ্যদ্বংশধর যেন নৈতিক চরিত্রের বলে বলিয়ান হয় ও সঠিক ইসলামী ছাঁচে গড়ে ওঠে, সেটাকে নিশ্চিত করার জন্য এ বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

সন্তানদের মানসিক ও চারিত্রিক গঠনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশঃ

প্রশ্ন হতে পারে যে, নবজাত শিশুর সাথে পরিবেশের কী সম্পর্ক? আর তার মানসিক ও চারিত্রিক গঠন বলতে কী বুঝায়? সাধারণ মানুষের নিকট নবজাত শিশু এমন এক জীব যা কেবল ঘুমায়, জাগ্রত হয়, খায়, কাঁদে ও হাসে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, শিশুতো মাতৃগর্ভেই শুনা ও দেখার যোগ্য হয় আর তার ইন্দ্রিয় অনেকাংশে এ কাজ করে থাকে। গর্ভের বাইরে এসে তার এ যোগ্যতাসমূহে বুৎপত্তি লাভ হতে থাকে। আমি আগেই বর্ণনা করে এসেছি যে, ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞান অনুযায়ী শিশু মাতৃগর্ভে শুনে ও দেখে থাকে। এজন্য যখন সে এ দুনিয়াতে আসে তখন তার এসব যোগ্যতা এবং শক্তি ক্রমবিকাশ লাভ করতে থাকে। এজন্য আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, নবজাতক শিশুর কানে আযান ও তকবীর বলা হোক, যেন জন্মাবার সাথে সাথে তার মনে খোদা তাআলার তৌহিদ (একত্ববাদ) ও হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের (নবুওয়াতের) বাণী পৌঁছে যায়, যার ফলে তার শারীরিক ক্রমবিকাশের সাথে সাথে খোদার দাস হওয়ার যোগ্যতাও, তার মধ্যে জন্মাতে আরম্ভ করবে আর সে পরিবার এবং সমাজের জন্য কল্যাণ কর সত্ত্বারূপে গড়ে উঠবে।

(চলবে)

সুধী বৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম। অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আপনাদের অতি জনপ্রিয় সরাসরি সম্প্রচারিত বাংলা প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান সত্যের সন্ধানে (এপিসোড-১০) আগামী ২৮ এপ্রিল'১১ থেকে ১লা মে'১১ এই চারদিন ব্যাপী আনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, ইনশাআল্লাহ্।

বিস্তারিত অনুষ্ঠান সূচী নিচে দেওয়া হল ঃ

তারিখ	বার	জি,এম,টি	বাংলাদেশ সময়	ব্যাপ্তিকাল
২৮/০৪/২০১১	বৃহস্পতিবার	১৪.১০	০৮.১০	২ ঘন্টা
২৯/০৪/২০১১	শুক্রবার	১৪.৩০	০৮.৩০	১ ঘন্টা ৩০ মিনিট
৩০/০৪/২০১১	শনিবার	১২.৪৫	০৬.৪৫	২ ঘন্টা
০১/০৫/২০১১	রবিবার	১৪.১৫	০৮.১৫	২ ঘন্টা

সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠানটি আপনার পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন নিয়ে উপভোগ করার জন্য এবং সেই সঙ্গে অনুষ্ঠানটির সার্বিক সফলতার জন্য দোয়া জারী রাখার জন্য আপনাদের সকলকে বিনীত অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য লগ ইন করুন ঃ www.mta.tv

জ্ঞান পিপাসু ও অনুসন্ধিৎসু সকলকে প্রশ্ন পাঠাতে উৎসাহিত করুন।

প্রশ্ন পাঠাতে হলে ঃ

সরাসরি টেলিফোন করুন : **০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০১০**

অথবা, ফ্যাক্স করুন : **০০-৪৪-০২৮-৬৮৭-৮০৩৭**

অথবা, ই-মেইল করুন : **sslive@mta.tv**

হযরত উমর (রা.)

মূল: মাশহুদ আহমদ এবং ফজল আহমদ

ভাষান্তর: সিকদার তাহের আহমদ

(৩য় কিস্তি)

জেরুজালেম বিজয়

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে তার খিলাফতকালের দশ বছর সময়ে বহু স্মরণীয় ঘটনা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটি হলো ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেম বিজয়ের ঘটনা। সুবৃহৎ রোমান সেনাদলের চাপে একটি খ্রিস্টান ভূখণ্ড থেকে যখন কিনা জেরুজালেমের অধিবাসীরা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়েছিল, তখন মুসলমানরা নিজেদেরকে তাদের নিকট প্রিয় করেছিল। [তখন তারা মুসলমানদেরকে পছন্দ করছিল]। অগ্রসর রোমান বাহিনীর হাত থেকে জেরুজালেমের অধিবাসীদের রক্ষা করতে পারছিল না মুসলমানরা। তাই তারা তাদের [জেরুজালেমবাসীর] উপর ধার্য করা জিজিয়া কর ফিরিয়ে দিল। [জিজিয়া হচ্ছে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের উপর ধার্যকৃত প্রতিরক্ষা কর। মুসলমানরা জাকাত দেয় এবং প্রতিরক্ষার খাতিরে দরকার হলে সশরীরে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। এর বিপরীতে, অমুসলিম নাগরিকরা শুধু জিজিয়া কর প্রদান করে, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না।] জেরুজালেমের অধিবাসীরা মুসলমানদের এই চারিত্রিক সততা ও সরলতা দেখে অত্যন্ত অভিভূত হলো। তাই, যখন মুসলমানরা তাদের এই নগরের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করতে এগিয়ে এলো, তারা মোটেও উদ্বিগ্ন হলো না। এক দীর্ঘকাল অবরোধ করে রাখার পর হযরত উমর (রা.) স্বয়ং সেই শহরে আগমন করলেন। মদিনা ছেড়ে আসার পথে তিনি একজন মাত্র খাদেম এবং একটি মাত্র উট সঙ্গে নিয়েছিলেন। পথে তিন ও তার খাদেম পালাক্রমে সেই উটের পিঠে বসছিলেন। যখন তারা জেরুজালেমের নিকটবর্তী হলেন, তখন ছিল খাদেমটির পালা। সেই খাদেম তখন খলিফার উদ্দেশে বললো: "আমিরুল মু'মিনিন, আমি আমার পালা পরিত্যাগ করলাম। লোকের চোখে এটা খুবই খারাপ দেখাবে যদি আমি উটের পিঠে বসি আর আপনি রশি ধরে উটটি টেনে নিয়ে যান।"

কিন্তু হযরত উমর (রা.) পালা বদলাতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন: "আরে নাহ। আমি অন্যায় করতে পারবো না। ইসলামের সম্মানই আমাদের সবার জন্য যথেষ্ট।"

অতএব জেরুজালেমের লোকেরা দেখলো ভৃত্যকে উটে চড়িয়ে সামনে থেকে উটের রশি টেনে একজন বিনয়ী ব্যক্তি তাদের দিকে হেঁটে আসছেন। এই ঘটনা তাকে সেই নগরবাসীর কাছে প্রিয় করে তুললো, যারা কিনা কোনো যুদ্ধ ছাড়াই ইসলামী সাম্রাজ্যের অধীনে এসেছিল। তিনি নিম্নলিখিত শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন:

"আল্লাহ্‌র বান্দা, আমিরুল মু'মিনিন উমর-এর পক্ষ থেকে: জেরুজালেমবাসীকে জান-মালের নিরাপত্তা দান করা হলো। তাদের গির্জা ও ক্রুশ নিরাপদ থাকবে। এই সন্ধি এই নগরের সকল অধিবাসীর উপর প্রযোজ্য। তাদের প্রার্থনার স্থান অক্ষত থাকবে। এগুলো কেড়ে নেওয়া হবে না, ভেঙ্গে ফেলাও হবে না। জনগণ তাদের ধর্মপালনে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাদেরকে কোনো ঝঞ্ঝাটে ফেলা হবে না ... "

(তাবারি, ভলিউম ১২, পৃষ্ঠা: ১৯১)

অর্থডক্স খ্রিস্টান প্যাট্রিয়ার্ক সোফ্রনিয়াস হযরত উমরকে নগরের চাবি প্রদান করলো। এরপর হযরত উমর (রা.) আল আকসা মসজিদের স্থানে, যা খ্রিস্টানদের গির্জা থেকে দূরে, ইমামতি করে নামাজ পড়ালেন। তিনি গির্জায় নামাজ পড়লেন না এই কারণে যে, পরবর্তী সময়ে মুসলমানরা যেন কোনো গির্জার প্রতি কোনো ধরনের দাবি উত্থাপন করতে না পারে।

জেরুজালেমে তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করতে চাইলে বিশপ তাকে 'সখা' নামক স্থানের কথা বললেন। এই স্থানের টিলায় আল্লাহ্ হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। ইহুদিদেরকে উত্যক্ত করার জন্য খ্রিস্টানরা সেখানে আবর্জনা জমা করেছিল। উমর (রা.) এই জঞ্জাল পরিষ্কারের কাজে সহায়তা করেন এবং এর পরে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

তার নেতৃত্বে একটি সাদাসিধা কাঠের মসজিদ নির্মাণ করা হয় যেখানে তিন হাজার মুসুল্লি নামায পড়তে পারতো। পরবর্তীতে এটিকে বর্ধিত করে বর্তমান 'আল-আকসা' মসজিদে পরিণত করা হয়। এই টিলার আরেক অংশে ৬৯২ সালের পর প্রসিদ্ধ মিনারটি/ডুম [মসজিদ কুব্বাত আস্ সাখারিয়াহ/the Dome of the Rock, **যা বাইতুল মুকাদ্দাস নামেও পরিচিত**] নির্মাণ করা হয়। (আল-খতিব, পৃষ্ঠা: ৩৪)

মুসলিম রাষ্ট্রে তাদের অবস্থান এবং অধিকার রক্ষা করার জন্য খ্রিস্টানদের সঙ্গে উমারিইয়াহ সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেছেন হযরত উমর (রা.)। সিরিয়ার এই সফর শেষে প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি একটি বক্তৃতা করেন। এতে তিনি বলেন: "এই যুগে আল্লাহ্ আমাকে তোমাদের শাসক বানিয়েছেন। কিন্তু আমি তোমাদেরই একজন। একজন শাসকের জন্য বিশেষ কোনো সুযোগ-সুবিধা নেই। আমার উপর কিছু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে যা আমাকে পালন করতে হয়। আর এজন্য আমি আপনাদের সহযোগিতা চাই। সরকার [শাসন-ক্ষমতা] হচ্ছে একটি পবিত্র আমানত, আর এটাই আমার প্রচেষ্টা যে, কোনোভাবেই এই আমানতের খেয়ানত না করা। এই আমানত [ট্রাস্ট] আদায় করার জন্য আমাকে পাহারাদার হতে হবে। আমাকে কড়া হতে হবে, আমাকে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ব্যক্তিগত স্বভাব-বৈশিষ্টের ভিত্তিতে নয়, আমাকে প্রশাসন চালাতে হবে জনস্বার্থ রক্ষার্থে এবং জনগণের সার্বিক মঙ্গলসাধনের জন্য। এজন্য আল্লাহ্‌র কিতাবে দিক-নির্দেশনা রয়েছে। দিনকে দিন প্রশাসন চালাতে গিয়ে যে-সব হুকুমই আমি দেই না কেন, সেগুলো অবশ্যই কুরআনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে ইসলামের মাধ্যমে অনুগৃহীত করেছেন। আমাদের প্রতি তিনি তার রাসূলকে (সা.)

প্রেরণ করেছেন। তিনি আমাদেরকে একটি বিশেষ কাজের জন্য বেঁছে নিয়েছেন। আসুন আমরা সেই মিশন পূর্ণ করি। আর সেই বিশেষ কাজটি হচ্ছে ইসলামের অগ্রগতি। ইসলামেই আমাদের নিরাপত্তা নিহিত। যদি আমরা ভুল করি তবে আমাদের শাস্তি পেতে হবে।"

তার নেতৃত্বের ধরন বহু অমুসলিমকে বিস্মিত করেছে। আর অমুসলিমদেরকে তিনি যে অধিকার প্রদান করেছেন তা দেখে তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।

উমরের (রা.) খিলাফতকালে ইসলামের বিস্তৃতি

হযরত উমরের (রা.) খিলাফতকালে চতুর্দিকে ইসলামের বিস্তৃতি অব্যাহত থাকে। ইসলামের প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার আমলে যদিও বহু আক্রমণ ও বিজয় অর্জিত হয়েছে, কিন্তু এগুলো ধর্মবিস্তার ছিল না। যে-সব জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে আরবরা এসেছিল সেগুলোর সবগুলোই আহলে-কিতাব (ঐশী শিক্ষাপ্রাপ্ত ও নবীদের অনুসরণকারী) ছিল। তাই তারা ইসলাম গ্রহণে বাধ্য ছিল না। আসলে এটি একটি প্রক্রিয়া ছিল যেখানে বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে এবং নতুন নতুন বাণিজ্য-পথ খুলে গেছে ও বিস্তৃত হয়েছে।

এই বিস্তৃতি ও যুদ্ধগুলোর উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতার বিস্তার ঘটানো এবং অন্যান্য ধর্মমত ও সংস্কৃতির সঙ্গে জ্ঞানের আদান-প্রদান করা। বিশ্বে তখনকার প্রচলিত ভাবধারায় লোভ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ঈর্ষা দেখা যায়। বিশ্বজুড়ে সর্বত্রই তখন লড়াই চলছিল। অতএব, মুসলমানরা যখন বিভিন্ন দেশে মিশনারী/ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করলো এবং দেখলো যে তাদের ধর্মপ্রচারকদেরকে গালাগালি ও আক্রমণ করা হচ্ছে; যখন তারা আরো দেখলো যে, সেসব স্থানের অধিবাসীদের সঙ্গেও অন্যায্য আচরণ করা হচ্ছে, তখন স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করা ছাড়া তাদের অন্য কোনো পথ ছিল না। পবিত্র কুরআন তাদের প্রতি যে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে তা হলো:

"হে মানবজাতি, আমরা নর ও নারী থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছি। আর আমরা বিভিন্ন গোষ্ঠী ও গোত্রে তোমাদের বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। তোমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত, যে তোমাদের মাঝে সর্বাধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পুরোপুরি অবহিত।" (আল হুজুরাত: ১৪)

তাই মুসলমানরা অন্যান্য গোত্র ও ধর্মগুলোকে সম্মান করা শিখেছে। তবে পাশাপাশি তারা এটাও বিশ্বাস রাখে যে, সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলের জন্য তাদের কাছে উৎকৃষ্টতর বাণী রয়েছে। যাহোক, ধর্ম-প্রচারের/তবলীগের ক্ষেত্রে যদি তারা জুলুম-নির্যাতন ও আক্রমণের শিকার হয়, সেক্ষেত্রে তারা নিম্নলিখিত দিক-নির্দেশনার অনুসরণ করবে:

"তোমাদের সাধ্যানুযায়ী শক্তি সংহত করে এবং সীমান্ত সুরক্ষিত করে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নিও। এর মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ্‌র শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে ভীতসন্ত্রস্ত করে দিবে। এদের ছাড়া অন্য আরেক দলকেও (ভীতসন্ত্রস্ত করবে) যাদেরকে তোমরা না চিনলেও আল্লাহ্ চিনেন। আর তোমরা যা-ই আল্লাহ্‌র পথে খরচ করবে তোমাদেরকে এর পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না। আর তারা সন্ধির জন্য হাত বাড়ালে তুমিও এর জন্য হাত বাড়িয়ে দিও এবং আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করো। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।" (আল আনফাল: ৬১-৬২)

এই হেদায়াত ও অন্যান্য দিক-নির্দেশনাগুলো মুসলমানদের শান্তি, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি দেয়। কিন্তু এসব দিক-নির্দেশনা অনুসারে কোনো প্রার্থনার স্থান [মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা, সিনাগগ ইত্যাদি) কিংবা কোনো সাধারণ নাগরিককে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা যাবে না। যদি এক পক্ষ শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায় বা যুদ্ধবিরতির আবেদন জানায়, তবে অতিদ্রুত যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে।

নতুন এই ইসলামী সাম্রাজ্যের ইহুদি, খ্রিস্টান এবং যুরথ্রুস্টদেরকে 'জিম্মি' মর্যাদা দিয়ে নিঃশর্ত আইনী ও সামরিক সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছিল। তারা নিঃসন্দেহে অনুভব করছিল যে, বাইজান্টাইন খ্রিস্টানদের তুলনায় কিংবা ইরানীদের/পারস্যের তুলনায় তারা মুসলমানদের অধীনেই অধিকতর নিরাপদ রয়েছে, যেন তারা জেরুজালেমেই আছে। বাইজান্টিয়ান খ্রিস্টানরা কিংবা ইরানীরা নন-অর্থডক্স বিশ্বাসের/আকিদার প্রতি -যেমন আর্য ও নেস্টোরিয়ানদের প্রতি- খুব একটা সহিষ্ণু ছিল না। এ রকম পরামর্শও দেওয়া হয়েছিল যে, অর্থডক্স খ্রিস্টানদের দিক থেকে নেস্টোরিয়ানরা যেন আর জুলুম-নির্যাতনের শিকার না হয়। নেস্টোরিয়ানরা পূর্ববর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারবে। (Nicolle, P. 63)

মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিটি নতুন শহরে শাসক হিসেবে সেই শহরের লোক নিয়োগ করা হয়েছিল। শহরবাসী পোল-ট্যাক্স/মাথাপিছু কর দিত এবং এর বিনিময়ে মুসলিম সেনাদল তাদের নিরাপত্তার দিকটি দেখতো। যদিও তখন তারা মুসলিম সাম্রাজ্যের অধীনে চলে এসেছিল এবং মুসলিম সাম্রাজ্য তাদের নিরাপত্তার দিকটি দেখছিল, তথাপি বিজিত এই শহরগুলো এবং সেখানকার স্থানীয় লোকজন তাদের নিজস্ব আইন ও ঐতিহ্য অনুসারেই চলতো, যা কিনা তাদের লোকের দ্বারাই পরিচালিত হতো। শুধুমাত্র গভর্নর হতেন একজন আরবীয়, যাকে নিয়োগ করতেন খলিফা। গভর্নরের কাজ ছিল সহিষ্ণুতা ও স্বাধীনতার নতুন মানদণ্ড অনুসারে সবকিছু পরিচালিত করা। সেসব নতুন দেশে ভূমি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আরবীয়দেরকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করতেন হযরত উমর (রা.)। আর, ইসলামী আইন শুধুমাত্র মুসলমানদের প্রতি প্রয়োগ করা হতো।

এ রকম বহু গোত্রের উদাহরণ রয়েছে যেখানে তারা ইসলাম গ্রহণ না করা সত্ত্বেও মুসলিম সাম্রাজ্যের কাছ থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছে। মেসপটেমিয়ার বনু তাঘলিব গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। তারা জিজিয়া কর প্রদানেও অস্বীকৃতি জানায়। তখন হযরত উমর (রা.) তাদের প্রতি মার্জিত ভাষায় নিম্নোলিখিত জবাব দেন আর তারা তাতে সম্মত হয়:

"যেহেতু তারা তাদের পুরনো বিশ্বাস পরিত্যাগে অসম্মতি জানিয়েছে, তাই খলিফা উমর তাদের প্রতি কোনো ধরনের জোর প্রয়োগ করতে এবং তাদের ধর্মচর্চায় ব্যাঘাত ঘটাতে নিষেধ করেন। কিন্তু, তাদের গোত্র থেকে কোনো ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা বাঁধা দিতে পারবে না এবং তার সন্তানদেরকেও তারা বাপ্তাইজ করতে পারবে না।" (Arnold P. 49)

জিজিয়ার বিষয়ে, এটা যেন নিরাপত্তা করের মতো না দেখা যায়, মুসলমানদের মতো বনু তাঘলিব (গোত্র) গরিবদের জন্য একটি কর প্রদান করতে চেয়েছিল। হযরত উমর (রা.) এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন।

(চলবে)

শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেব–একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

অনুবাদ : মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেব (এস জি এস)-এর গঠন

শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেব হচ্ছে শিখদের সম্মানিত ও পবিত্র কিতাব। এতে ৫৮৯৪টি স্তবগান রয়েছে, যেগুলোকে শব্দ বলে এবং ওগুলো ১৮টি রাগ (সুরেলা ছাঁচ) এ বিন্যস্ত। এই ৫৮৯৪টি স্তবগানের ৯৭৬টি গুরু নানক, ৬১টি গুরু অঙ্গদ, ৯০৭টি গুরু অমর দাস, ২২১৬টি গুরু অর্জন, ১১৮টি গুরু তেগ বাহাদুর এবং ৯৩৭টি ১৫ জন ভগৎ ও বার্ড এর রচিত। এই ১৪৩০ পৃষ্ঠার এস জি জি এস মোট ৩৩টি অধ্যায়ে বিভক্ত।

প্রথম অধ্যায়টি গঠিত হয়েছে তিনটি মোনাজাত দিয়ে :– জপ্‌জি-সকালের প্রার্থনা; সদর-সন্ধ্যার প্রার্থনা এবং সোহেলা-শয়ন কালের প্রার্থনা। এর পরের অধ্যায়টি হলো গুরু ও ভগৎগণের বাণীর। প্রত্যেক শিখ গুরুর প্রায় প্রতিটি বাণীর শ্লোকই এর রচয়িতা হিসেবে নানকের ছদ্ম নাম দিয়ে শেষ হয়, তা সেটা গুরু নানক নিজের অথবা তাঁর স্থলাভিষিক্ত অন্য যে কোন শিখ গুরু দ্বারাই রচিত হয়ে থাকে। সব গুরুদের কর্তৃত্বের একত্ব এবং গুরু নানকের ছদ্ম নামের আড়ালে তাঁর পূরো দর্শনের ঐক্য প্রদর্শনের লক্ষ্য গুরু অর্জুন কর্তৃক এই পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তদ্‌সত্ত্বেও, একাজে অংশগ্রহণকারী গুরুর পরিচয় গুরু নানকের স্থলাভিষিক্তকরণ সংখ্যা দ্বারাই নির্ধারণ করা হয়। এর প্রতিটি অংশকেই গুরু অর্জুন কর্তৃক 'মহ্‌লা' নাম দেয়া হয়েছে। এভাবে শিখ মতবাদের স্থপিত হিসেবে গুরু নানক-প্রদত্ত অংশকে 'মহ্‌লা'-১, দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদের স্তবককে 'মাহ্‌লা'-২, তৃতীয় গুরু অমরদাসের স্তবককে 'মাহ্‌লা'-৩, এভাবে ক্রমান্বয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। এস জি জি এস এর মূল গ্রন্থ জুড়ে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। 'ভগৎ বাণী' অধ্যায় কবির, ফরিদ, নামদেব, রবিদাস, ত্রিলোচন, বেনী, ধানা, জয়দেব, সাইন, পিপা, সাধনা এবং রামানন্দ ও পরমানন্দ নামীয় ১৩ জন ভগৎগণ মধ্যযুগীয় ভারতে ভগতী আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। তারা ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মের দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। মন্দভিনা (সমাপ্তি বা মোহর) অনুসরিত এস জি জি এস এর এক অংশে ভাটদের স্বাবিয়াকে একত্রে বিন্যস্ত করা হয়েছে। শেষ অধ্যায় হলো প্রাপ্তি স্বীকারের (শ্লোক)। এটাই হচ্ছে এস জি জি এস এর মূল পাঠের সমাপ্তি, যার মধ্যে গুরু অর্জুন তার এস জি জি এস এর মত স্বর্গীয় জ্ঞানভান্ডার সম্পাদনের কাজে সক্ষম করার জন্য সর্ব শক্তিমানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। দশম ও শেষ গুরু গোবিন্দ সিং এস জি জি এস কে চিরন্তন এ জীবন্ত গুরু বলে ঘোষণা করেন। 'পান্থ' নামীয় সম্প্রদায়টিকে দেহ 'গ্রন্থ'কে উহার আত্মা হিসাবে বিবেচনা করে থাকে।

এস জি এস -এর আবৃত্তির ধরন

শব্দ কীর্ত্তন :- এস জি জি এস এর স্তবকগুলো প্রতিদিন সকাল ও বিকালের প্রার্থনার সময় পাঠ করাকে 'শব্দ কীর্ত্তন' বলা হয়।

আখন্দ পাঠ :- বিরতিহীন ভাবে এস জি জি এস এর প্রথম পৃষ্ঠা থেকে পূরো ১৪৩০ পৃষ্ঠা পূর্ব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঠ করাকে 'আখন্দ পাঠ' বলে। সময়ের দৈর্ঘ সাধারণত ৪৮ ঘন্টা হয়ে থাকে কিন্তু এ ভিন্নতা দ্বারা অন্যান্য সময়-সীমাও বোঝানো হয়ে থাকে।

সঙ্কলনের ইতিহাস

এর সঙ্কলনের পদ্ধতি এক গুরত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হয়ে আছে। ঐতিহ্যগত ধারণা হলো, সাধু ও মরমী কবিদের সংগৃহীত রচনাসমূহ সহ 'বাণী'গুলো (কবিতা/লেখা) ছত্রাকারে ও ক্রমান্বয়ে প্রথম থেকে পঞ্চম গুরুর লেখা লিপিবদ্ধ করে একই ভাবে দশম গুরুর লেখা দিয়ে শেষ করা হয়েছে। এস জি জি এস এ সঙ্কলন দুই পর্যায়ে সম্পাদিত হয়েছে। এর প্রথম পর্যায়টি 'আদি গ্রন্থ' নামে পরিচিত যা পঞ্চম শিখগুরু গুরু অর্জুন দেব কর্তৃক, যিনি 'কর্তারপুরী বীর' বলে খ্যাত, ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে সঙ্কলিত হয়েছে। 'দমদমি বীর' নামক দ্বিতীয় অংশটি ১৭০৮ সনে দশম-গুরু গুরু গোবিন্দ সিং নিজ স্মৃতি মন্থন করে সঙ্কলন করেন, যখন 'ধীরমলের' বংশধর ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ সিং এর নাতি তাকে মূল কপিটি দিতে অস্বীকার করে। গুরু গোবিন্দ সিং তার পিতা নবম-গুরু তেগ বাহাদুরের বাণী সংযুক্ত করে বাই মনিসিং এর কাছে এস জি জি এস এর শ্রুতিলিপি পেশ করেন। 'দশম গ্রন্থ'ও 'সরব-লোহ্' নামে তিনি আরো দু'টি গ্রন্থ রচনা করেন। যুদ্ধের শিক্ষা সম্বলিত পরের গ্রন্থটি মোঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য শিখদেরকে উদ্দীপ্ত করে। 'আকালি নিহাং শিখদের' দ্বরা এই বইটি কঠোর ভাবে গোপন রাখা হয়। তার জীবনের শেষ প্রান্তে এসে গুরু গোবিন্দ সিং এস জি জি এস কে অবরোধ করে তা থেকে সহৃদয় গুরুদের-গুরুদের পংক্তিগুলো বাদ দিয়ে সেটাকে চিরন্তন গুরু ও তার সরকারি-উত্তরাধিকারীর মর্যাদা দান করেন। বর্ণিত আছে যে, গুরু নানক মৃত্যুর পূর্বে তাঁর লেখা ও বিভিন্ন সন্যাসীর রচনা সংগ্রহ করে তাঁর অন্যতম শিষ্য ও উত্তরাধিকারী গুরু অঙ্গদ, যিনি পূর্বে 'লোহনা' নামে পরিচিত ছিলেন, তার কাছে সমর্পন করলে তিনি ওগুলোকে নিজের রচনা সমেত তৃতীয় গুরু গুরু অমর দাসের কাছে সমর্পণ করেন। শেষ জন এই সংগ্রহের সাথে নিজের রচনা যুক্ত করেন । গুরু অমর দাসের মোহন ও মোহরি নামে দুই পুত্র ও বিবি ভানি নামে এক কন্যা ছিল। বড় ছেলে হিসেবে বাবা মোহন পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে চতুর্থ গুরুর দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। যাহোক, এ বিষয়ে গুরু অমর দাসের চিন্তা ছিল ভিন্ন এবং তিনি তাঁর জামাতা ভাই জেঠাকে চতুর্থ গুরুর মনোনয়ন দান করেন এবং 'রাম দাস' বলে আখ্যায়িত করেন। মনে হয়, বাবা মোহন বিষয়টি আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিলেন এবং ভাই জেঠার প্রতি ঈর্ষান্বিত ছেলেন। চতুর্থ ধারণা করা হয় যে, তিনি পিতার রচনা সংগৃহীত রচনা সমূহের উপর হস্তক্ষেপ করেন। চতুর্থ গুরুর উপর 'গুর'র দায়িত্ব অর্পনের সময় ওগুলোকে গুরু অমর দাসের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি। এসব সংগ্রহাদি 'মোহন পথি' নামে খ্যাত।

গুরু অর্জুন যখন পঞ্চম গুরু হিসেবে নিযুক্ত হন, তখন তার কাছে কেবল তার পিতা ও সন্যাসীদের ঐসব রচনাই বর্তমান ছিল, যেগুলো তার কাছে উপস্থাপন করা হয়েছিল। যখন তিনি গ্রন্থটি সঙ্কলন করতে মনস্থ করলেন, তখন তাঁর আগের তিনজন গুরু সন্যাসীদের লেখাগুলোরও প্রয়োজন হলো, যেগুলো বাব মোহনের কাছে ছিল। তিনি লেখাগুলো হস্তান্তরের অনুরোধ জানিয়ে একের পর এক বাবা বুদ্ধ ও ভাই গুরুদাসকে

বাবা মোহনের কাছে পাঠালেন, কিন্তু তারা ফিরে আসলেন। বর্ণিত আছে যে, অতঃপর গুরু অর্জুন ব্যক্তিগত ভাবে বাবা মোহনের কাছে গেলেন, যিনি একটি দ্বিতল-বাড়ীতে বাস করতেন, মোহনের প্রশংসায় একটি 'শব্দ' আবৃত্তি করলেন। বাবা মোহন স্তবকটি শুনে প্ররোচিত হলেন, পুঁথিটি (পান্ডুলিপি)সহ নীচে নেমে এলেন এবং এগুলো গুরুর কাছে উপস্থাপন করলেন। যাহোক, প্রফেসর দেবিন্দর সিং চাহল, পি এইচ ডি, তার লেখা প্রবন্ধ 'আদ গুরু গ্রন্থ সাহেব–ভ্রমাত্মক ধারণা ও সত্য'তে এই কাহিনীকে বানোয়াট আখ্যা দিয়ে তা খন্ডন করেন। তাঁর মতে 'পথি'গুলো আগে থেকেই গুরু অর্জুনের কাছে ছিল এবং আরোপিত 'শব্দ'টি ছিল খোদার প্রশংসায়, বাবা মোহনের প্রশংসায় নয়। গুরবিলাস এবং অন্যান্য শিখ ইতিহাস-গ্রন্থে উপর্যুক্ত কাহিনীর ক্রমধারায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, এস জি জি এস এর সম্পূর্ণ করণ অনেক বিশাল এক আনন্দোৎসবের মাধ্যমে উদযাপন করা হয়েছে। অধিক সংখ্যায় শিখরা এস জি জি এস দেখতে আসে। দর্শকদের মধ্যে ছিলেন 'ভাই বান্নু' যিনি পশ্চিম পাঞ্জাবের মানগাত থেকে আসা এক দল শিখের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। গুরু অর্জুন, যিনি তাকে একজন নিষ্ঠাবান বলে জানতেন, এ জি জি এস-কে লাহোর নিয়ে বাঁধাই করতে নির্দেশ দিলেন। এই পবিত্র দায়িত নিয়ে বান্নু যখন অমৃতসর ত্যাগ করলেন, তখন তিনি এর নকল দ্বিতীয় একটি কপি হাতে পেলেন। তিনি চাইলেন, প্রথম কপিটি গুরুর কাছে থাক, এবং সমাবেশের জন্য তার কাছে অবশ্যই একটি অতিরিক্ত কপিও থাক। দায়িত্ব প্রদানের জন্য তাঁর সাথীরা ভালবাসা ও নিষ্ঠার সাথে আবেদন করলেন এবং দিনেই হোক অথবা রাতেই হোক, কেউই তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব এড়ালেন না। ইতোমধ্যে তারা লাহোর পৌঁছলেন। দ্বিতীয় কপিটি প্রস্তুত ছিল। কিন্তু বান্নু এতে কতিপয় অ-প্রামাণিক বিষয়বস্তু যোগ করেছিলেন। ফিরে এসে তিনি উভয় খন্ড উপস্থাপন করলেন এবং তিনি আরেকটি কপি বানিয়েছিলেন, গুরুর কাছে তার ব্যাখ্যা প্রদান করলেন। কিন্তু গুরু কেবল সেই খন্ডটির উপরই তাঁর সীলমোর লাগালেন, যে খন্ডটি ভাই গুরুদাস লিখেছিলেন এবং যেটা ১৬ আগষ্ট, ১৬০৪ সনে মন্দিরের মধ্য খানে পবিত্র স্থানে স্থাপিত হয়েছিল।

গুরু অর্জুন কর্তৃক এস জি জি এস সঙ্কলনের কারণ যে কারণে গুরু অর্জুন এস জি জি এস সঙ্কলন করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা হলো, গুরু অর্জুনের বড় ভাই পৃথিচাঁদ এর ছেলে মেহেরবান, যে গুরু অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, সে তার নিজের গ্রন্থ গুরু নানকের ছদ্ম নাম রচনা ও প্রচার শুরু করেছিল। তার সঙ্কলিত গ্রন্থ দ্বারা শিখ সম্প্রদায় প্রভাবিত হয়ে তাকেই গুরু হিসেবে শ্রদ্ধা শুরু করেছিল। তার সঙ্কলিত গ্রন্থ দ্বারা শিখ সম্প্রদায় প্রভাবিত হয়ে তাকেই গুরু হিসেবে শ্রদ্ধা করতে শুরু করে। শান্ত সেওয়া সিং তার বই 'গুরু গ্রন্থ সাহেব দর্শন'এ ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেন ঃ 'গুরু অর্জুন দেব জি'-র জীবদ্দশায় পৃথিচাঁদের বড় ছেলে মেহেরবান 'নানক' নামের অধীনে তার নিজের অপরিণত স্তবকে লেখা আরম্ভ করে। এদ্বারা সমাবেশের সাধারণ সাদাসিধে জনতা প্রায়শঃ বিভ্রান্ত ও প্রাতারিত হতো। আসল গুরু বাণী এবং মেহেরবানের কবিতা উভয়ের শেষে 'নানক' উল্লেখ থাকায় তারা এতোদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে হতবুদ্ধ হয়ে পড়তো। প্রথম চারজন গুরুর মূল স্তবকের সাথে মেহেরবান তার নিজের কবিতা 'নানক' এর নামে যুক্ত করে একটি গ্রন্থ বানিয়েছিল"।

এস জি জি এস (বীর)-এর ভিন্ন রূপ

এস জি জি এস এর ভিন্ন 'বীর' (পান্ডুলিপি) সম্পর্কে, ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব পাঞ্জাব ষ্ট্যাডিজ, ভাই বীর সিং সাহিত্য সদন, নয়া দিল্লী–এর ডাইরেক্টর মহিন্দর সিং তার প্রবন্ধ 'কনজার্ভিং গুরু গ্রন্থ সাহেব' এর পান্ডুলিপিতে লিখেন :-"যেহেতু আগের দিনগুলোয় মুদ্রন অথবা গ্রন্থটির অনুলিপি তৈরীর অন্য কোন উপায় ছিলনা, 'বীর' এর হস্তলিখিত কপি করার কাজকে প্রশংসনীয় ধর্মীয়গুণ বলে বিবেচনা করা হতো। আত্ম-উৎসর্গকারীরা সমাবেশ সফল করার স্বার্থে মাসের পর মাস পরিস্কারভাবে 'বীর' নকলের কাজ করতো। যাহোক, সপ্তদশ ও অষ্টদশ শতাব্দীর কতিপয় বিরল ও গুরু গ্রন্থ বীর এর জরীপে দেখা যায় যে, ভাই ভানু কর্তৃক কপিকৃত বীর-এ গুরুর অনুমোদন না থাকা সত্বেও কতিপয় আত্মনিবেদিত ব্যক্তি 'কর্তারপুরী বীরে'র পাশাপাশি এর কপিসমূহও তৈরী করেন"। যেহেতু গুরুর প্রতিদ্বন্দ্বী ধীরমল ও তার সমর্থকরা 'কর্তারপুর বীর'টি গুরু তেগ বাহাদুরকে দেয়নি, সেজন্য দশম গুরু গোবিন্দ সিংকে 'গুরু গ্রন্থ সাহেব' এর আরেকটি খন্ড প্রস্তুত করতে হয়েছিল যেটার জনপ্রিয় নাম হচ্ছে 'দমদমি বীর', যার মধ্যে তার পিতা 'গুরু তেগ বাহাদুর' এর কতিপয় স্তবকও যোগ করা হয়। এটা 'গুরু গ্রন্থ সাহেব' এর সেই খন্ড, যেটা মুদ্রিত 'গুরু গ্রন্থ সাহেব' এর প্রামাণিক মূলপাঠ সরবরাহ করে"।

'গুরু গ্রন্থ সাহেব'-এর পান্ডুলিপির অবস্থান নির্দেশ ও তালিকা প্রস্তুত করার প্রথম আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন সর্দার জি বি সিং, যিনি ছিলেন ভারতের পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। এ প্রচেষ্টার দ্বারা তিনি 'শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেব দিয়ান প্রাচীন বীরান' নামে একটি বই প্রকাশ করলেন, যেটা 'প্রাচীন বিরান' (অসাধারণ পান্ডুলিপি) নামে খ্যাতি লাভ করে। বইটির মুখবন্ধে জি বি সিং লিখেন যে, তিনি অসাধারণ গুরু গ্রন্থ সাহেব'এর পান্ডলিপি পাঠে কৌতুহলী হলে ঢাকাস্থ 'শিখ সংগত' তাকে গুরু তেগ বাহাদুরের কতিপয় অসাধারণ 'হুকুম নামা' তাকে উপহার দেন, যখন ১৯১৫ সনে তিনি সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলেন।

ডাক বিভাগের চাকুরীর দীর্ঘকাল ব্যপি ভারত বর্ষের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের সময় তিনি আরো কতিপয় অসাধারণ 'গুরু গ্রন্থ বীর' খুঁজে বের করে তা পাঠ করার চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। সে সময় ফটোকপি, মাইক্রোফিল্ম অথবা ডিজিটাইজ করার সুবিধা না থাকায় জি বি সিং নিজেই সম্পূর্ণ নোট নিতেন এসব পান্ডুলিপিতে যখন তিনি গুরুর হাতের কোন লেখা দেখতে পেতেন, তিনি বিশ্বস্ততার সাথে ট্রেসিং পেপার ব্যবহার করে সেগুলো নকল করতেন এবং উপরোল্লেখিত তার বইয়ে পুনস্থাপন করতেন। তার বইয়ে জি বি সিং সেসব অসাধারণ পান্ডুলিপির কথা, যেগুলো গবেষণা কালে তিনি পাঠ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, উল্লেখ করেন। কর্তারপুর বীর, দমদমি বীর, ভাই বানু বীর, বুড়া সন্ধু বীর, পিন্ডি লালা বীর (১৯৮৪ সনে স্বর্ণ মন্দিরের সেনা হামলার সময় ধ্বংস প্রাপ্ত) দেরাদুন বীর এবং আগ্রা, মীর্জাপুর, লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যায়, এলহাবাদ, বুরহানপুর ও পাটনায় প্রাপ্ত অন্যান্য অসাধারণ পান্ডুলিপি গুলোও এগুলোর অন্তর্ভুক্ত। 'পঞ্চম গুরু' যদিও ভাই বানুর 'আদি গ্রন্থ' নামক নকল করার কাজ অনুমোধন করেন নি, তবুও কেতুহলের সাথে লক্ষ্যণীয় যে, বর্তমানে 'কর্তারপুর বীর' নামে পরিচিতি মূল 'বীর'টি 'ধীরমল' এর উত্তরাধিকারীদের হাতে চলে গিয়েছিল, যারা তাতে প্রবেশাধিকার না দিলেও, ভক্তরা স্টোর কপি করে চলে। এমতাবস্থায় ধার্মিক শিখদের জন্য 'বানু বীর' এর কপি করা ভিন্ন আর কোন উপায় ছিল না, কারণ সেটাই সহজলভ্য ছিল। সে কারণ আমরা বানু বীর এর অনেক পান্ডুলিপি দেখতে পাই। (অসমাপ্ত)

তথ্য সূত্র ঃ www.alislam.org

সংবাদ

সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৮/০২/২০১১ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ নাসেরাবাদ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব শওকত আলী সাহেবের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পরিবেশনের মাধ্যমে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসার কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বাল্যকাল, আদর্শ ও নবুওয়াত জীবন প্রচার কাজ এবং রাসূল প্রেমে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর উপর বক্তৃতা করেন পর্যায়ক্রমে জনাব মোহাম্মদ মজিবুর রহমান, স্থানীয় মোয়াল্লেম। সভাপতি সাহেব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র জীবনী ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর জামা'তের অগ্রগতি এবং শেষে হুযূরের খুতবা দেখার প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরিশেষে দোয়া এবং মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ২৪ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ মজিবর রহমান

সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০১১ তারিখ মজলিস আনসারুল্লাহ্ খাকদানের উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা পালন করা হয়। উক্ত জলসায় বক্তব্য রাখেন পর্যায়ক্রমে সর্বজনাব মুহাম্মদ জালাল আহমদ, সুলতান আহমদ ও মৌ. আব্দুর রহিম মোয়াল্লেম। বক্তরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেন এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর রঙে রঙিন হওয়ার জন্য দর্শকদের আহ্বান জানান।

মুহাম্মদ জালাল আহমদ

সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৮/০২/২০১১ তারিখ বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চান্দপুর চাবাগান জামাতের উদ্যোগে জনাব আব্দুল কাদির চৌধুরী সাহেবের সভাপতিত্বে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে মহানবী (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন সর্বজনাব দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী, মোহাম্মদ আব্দুর রহিম, আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, জাকির হোসেন ভূইয়া, মাহমুদুল হাসান পাতান ও ছারোয়ার হোসেন চৌধুরী, সভাপতির বক্তৃতার পর দোয়া ও মিষ্টি বিতরনের মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে নও মোবাইন ও তবলিগী সেমিনার অনুষ্ঠিত

নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে গত ৪-০৩-১১ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ নও মোবাইন ও তবলিগী সেমিনার সফলতার সাথে উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় মজলিসের প্রেসিডেন্ট মোহতরমা দিলরুবা বেগম মায়া-এর সভানেত্রীত্বে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে সেমিনারের কাজ শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন আবেদা চৌধুরী। শিক্ষামূলক বক্তব্য রাখেন দিলরুবা বেগম মায়া, প্রশ্ন উত্তর পর্ব পরিচালনা করেন হামিদা খায়ের। পরিশেষে ইজতেমায়ী দোয়া পরিচালনা করেন আবেদা চৌধুরী। উক্ত অনুষ্ঠানে ২৩ জন লাজনা, নাসেরাত ১৩ জন, নও মোবাইন ৭ জন ও জেরে তবলীগ ২ জন উপস্থিত ছিলেন। আপ্যায়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। **-উম্মে কুলসুম চায়না**

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার উদ্যোগে ৫ম নাসেরাত দিবস উদযাপন

কেন্দ্রীয় বার্ষিক কর্মসূচী অনুযায়ী গত ১৯ মার্চ ২০১১ তারিখ শনিবার, লাজনা ইমাইল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার উদ্যোগে ৫ম নাসেরাত দিবস এর আয়োজন করা হয়। স্থানীয় মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ-এ দিনব্যাপী উক্ত অনুষ্ঠান সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। অনুষ্ঠানে ৭৫ জন নাসেরাত ও অন্যান্য কর্মকর্তা মিলে শতাধিক সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। শেষে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সফল সমাপ্তি ঘটে।

নাসিমা আসাদ

১৬তম তালিম তরবিয়তী ক্লাস এবং ২৬তম ইজতেমা অনুষ্ঠিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ক্রোড়ায় অত্যন্ত সফলতার সাথে ১৬তম তালিম তরবিয়তী ক্লাস ও ২৬তম বার্ষিক ইজতেমা ২০১১ উদযাপন করা হয়েছে। এতে আতফালের উপস্থিতি ছিল শতভাগ এবং কেন্দ্র থেকে অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় প্রতিটি ক্লাসই ছিল প্রাণবন্ত। টিটি ক্লাস ও ইজতেমার শেষে পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ নাজির হোসেন ভূইয়া (কায়েদ) প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব গাজী মাজহারুল ইসলাম, প্রেসিডেন্ট ক্রোড়া। শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মৌ. এনামুল হক রনী, মোয়াল্লেম ঘাটুরা এবং মৌ. আসাদুল্লাহ্ আসাদ মোয়াল্লেম বি, বাড়ীয়া। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জনাব মইনুল হক ভুইয়া, চেয়ারম্যান ইজতেমা কমিটি। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব মারুফুর রহমান সান্টু। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

দূর্গরামপুরে মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন

গত ২৩ মার্চ ২০১১ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত দূর্গারামপুরে বাদ মাগরিব হতে রাত ৯-৩০মিঃ পর্যন্ত মসীহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট ডা: মোহাম্মদ তৌফিক-ই-ইলাহী। অনুষ্ঠানের শুরুতেই কুরআন তেলাওয়াত করেন মেহেদী সোলেমান। বাংলা নযম পাঠ করেন আব্দুল হাই। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনী ও ২৩ মার্চ এর তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন জনাব বেলাল আহমদ, জনাব হাবিবুর রহমান [বেলজিয়াম জামা'ত] জনাব ডা: তৌফিক-ই-ইলাহী। লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন মিসেস সুলতানা রাজীয়া, ডা: মিসেস আবেনূর বেগম, মিসেস ছালমা বেগম ও মিসেস নাজমা বেগম। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লিখিত নযম পাঠ করেন মিসেস সাদেকা তাহের। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ডা: তৌফিক-ই-ইলাহী

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামা'তে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার উদ্যোগে গত ২০ ফেব্রুয়ারী মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ-এ বাদ মাগরীব থেকে শুরু করে রাত ১০টা পর্যন্ত মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালিত হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে মোহতরম মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সভাপতিত্বে কুরআন তেলাওয়াত এবং নযম পেশ করেন যথাক্রমে তৌফিক সরকার এবং মুফতি মাহমুদ মৌসাদ। এরপর দিবসটির তাৎপর্য গুরুত্ব এবং বিভিন্ন দিক নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন এখতিয়ার উদ্দিন শুভ, মওলানা নওশাদ আহমদ, মৌ. আসাদুল্লাহ্ আসাদ, মোস্তাক আহমদ খন্দকার (নায়েব আমীর)। এরপর নযম বাংলা উপস্থাপন করেন নাসের আহমদ। সবশেষে মোহতরম আমীর সাহেবের সমাপনী ভাষণ, দোয়া এবং মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে আলোচনা সভার কার্যক্রম শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৩০৩ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। **-কবির আহমদ**

মাহীগঞ্জ জামা'তে মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন

গত ২৩/০৩/২০১১ তারিখ রোজ বুধবার বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মাহীগঞ্জ-এর উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে এবং কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে মসীহ্ মাওউদ দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম, উর্দু নযম পেশ করেন মোহাম্মদ সুজন মিয়া এরপর বক্তৃতা করেন জনাব মোহাম্মদ শাহাদত হোসেন, মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন, মোহাম্মদ আব্দুল খালেক, মোহাম্মদ আলাউদ্দিন মিয়া। এরপর বাংলা নযম পেশ করেন মোহাম্মদ গোলাম রাব্বি। বক্তৃতা করেন মৌ. এস, এম, রাসিদুল ইসলাম। প্রত্যেক বক্তা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। শেষে প্রেসিডেন্ট সাহেবের সমাপনি ভাষণের মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। অনুষ্ঠানে মোট ৭০ জন সদস্য/ সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। শেষে সকলের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

মোহাম্মদ আলাউদ্দিন মিয়া

রংপুর জামা'তে মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন

গত ২৬/০৩/২০১১ তারিখ রংপুরের উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ সাহেবের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসটি আরম্ভ হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের তাৎপর্য তুলে ধরে বিভিন্ন বিষয়ের উপর মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন সর্বজনাব রাশেদুজ্জামান (রাব্বি), আহমদ তাহমিদুজ্জামান, মোহাম্মদ আফজাল হোসেন, মোহাম্মদ আব্দুল গনি, মোহাম্মদ হামিদুল্লাহ্, মসীহেজ্জামান (শাহিন) এবং স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. জাকির হোসেন প্রমুখ। দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে ১৬ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট

ক্রোড়ায় মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন

মজিলস খোদ্দামুল আহমদীয়া ক্রোড়ার উদ্যোগে গত ২৩ মার্চ মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। জামাতের সকল খোদ্দাম আতফল, লাজনা, নাসেরাত ও আনসারগণও উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব আসাদুজ্জামান ভূইয়ার সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। ডা: খলিলুর রহমান, মৌ. আসাদুল্লাহ্ আসাদ, মোয়াল্লেম, মৌ. মোজাম্মেল হক, মোয়াল্লেম উক্ত অনুষ্ঠানে তাদের বক্তৃতা প্রদান করেন। নযম পাঠ করেন জনাব এনামুল হক (ইন্টু)।

তেজগাঁও লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপিত

গত ২৫.০৩.১১ইং রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তেজগাঁও মসজিদে লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেজগাঁও-এর উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। দিবসের কার্যক্রম শুরু হয় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে। এর পর নযম পাঠ করা হয়। মসীহ মাওউদ দিবসের পটভূমি ও বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় মোয়াল্লেম সাহেব। এছাড়া হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা ও তাঁকে মানার গুরুত্ব সম্পর্কে স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহর সদস্যাগণ পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, তেজগাঁও

তেরগাতী জামা'তে মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন

গত ২৩ মার্চ বাদ মাগরিব হতে মাইক যোগে রাত ১০ ঘটিকা পর্যন্ত সৈয়দ আনোয়ার আলী সাহেবের সভাপতিত্বে দিনটি অত্যন্ত জাঁকজমক ভাবে পালন করা হয়। শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন আব্দুর রব খন্দকার, বক্তৃতা প্রদান করেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমন ও সত্যতা প্রসঙ্গে জনাব আবু বকর সিদ্দীক, নূরুল ইসলাম, মৌ. বশির আহমদ ও জেলা নাযেম মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। প্রেসিডেন্ট সৈয়দ আনোয়ার আলী সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৬০ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

নজরুল ইসলাম

তেজগাঁও জামা'তে মসীহ্ মাওউদ দিবস পালিত

গত ০১/০৪/২০১১ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তেজগাঁও-এর উদ্যোগে স্থানীয় মসজিদ 'আল মসজিদ বায়তুল ইসলাম'-এ মসীহ্ মাওউদ দিবস পালিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট মোহতরম মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ আবদুল করিম। বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব শাহীন আহমদ। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা, তাঁর বিরোধীতা, তাঁকে মান্য করার গুরুত্ব, তাঁর সত্যতার নিদর্শন সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় জামাতের মোয়াল্লেম মৌ. মাহমুদ আহমদ সুমন, জামা'তের সেক্রেটারী তালিম জনাব তরিকুল ইসলাম, আনসারুল্লাহ্‌র যয়ীম জনাব মাকসুদ আহমদ, সেক্রেটারী ফাইনান্স জনাব মোহাম্মদ আবদুস সালাম, জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ কায়সার আলম। শেষে স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব অত্যন্ত জ্ঞানগর্ব বক্তব্য রাখেন। তিনি তার বক্তৃতায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর জামা'তের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় যে উপদেশ দিয়েছেন তা তুলে ধরেন এবং সকলকে তা মেনে চলে জীবন পরিচালনা করার নির্দেশ দেন। শেষে তিনি দোয়া পরিচালনা করেন। দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে জামা'তের বেশীর ভাগ সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন এবং সবাই অত্যন্ত মনোযোগের সাথে বক্তব্য শ্রবণ করেন। **-মোহাম্মদ কায়সার আলম**

তেবাড়িয়ায় মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন

গত ২৩ মার্চ রোজ বুধবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তেবাড়িয়ার উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। জনাব মোহসেন আলী রেজা প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে নযম পরিবেশন করেন জনাব ইফতেখার উদ্দিন শোভন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কর্মময় জীবনের আদর্শ, সাদাকাতে মসীহ্ ও তাঁকে মান্য করার গুরুত্ব আর অমান্য করার প্রতিফলন বিষয়ে বক্তৃতা করেন সর্বজনাব এহিয়া উদ্দিন সুজন, মৌ. শাহ আলাম খান, রেজাউল করীম, প্রফেসর জনাব আব্দুল মতিন। সবশেষে সভাপতির ভাষণ, দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে। **-শাহ আলাম খান**

খাকদানে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন

গত ২৫/০২/২০১১ তারিখে যথাযোগ্য মর্যাদায় মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও তাঁর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন জালাল আহমদ ও মাহমুদ আহমদ জুয়েল। জামাতের ৩৫ জন সদস্য/সদস্যা এতে উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ জালাল আহমদ

নাটাই জামা'তে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন

গত ৮ মার্চ রোজ মঙ্গলবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নাটাই-এর উদ্যোগে অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্য ও রূহানী পরিবেশে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালিত হয়। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর বাল্যকাল এ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন সর্ব জনাব আহসানউল্লাহ্ সিকদার, হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর খিলাফত ও কর্মময় জীবনের উল্লেখযোগ্য দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা নওশাদ আহমদ । হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ও পূর্ণতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মোহতরম আমীর বি, বাড়িয়া। সবশেষে দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট এস, এম, তৌফিক বেলাল অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। **-আহসান উল্লাহ্ সিকদার**

চান্দপুর চা বাগানে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন

গত ২৫/০২/২০১১ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চান্দপুর চা বাগান জামা'তের উদ্যোগে বাদ জুমুআ মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব আনোয়ার হোসেন চৌধুরী। তেলাওয়াতে কুরআন পাঠ করেন কামরুল হাসান ইমন, নযম পাঠ করেন ছারোয়ার হোসেন চৌধুরী। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তৃতা করেন সর্বজনাব রফিক আহমদ চৌধুরী, মাহমুদুল হাসান পাপন, মোহাম্মদ ইকবাল চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট সিলেট জামাত। মৌ. রফিকুল ইসলাম, মোয়াল্লেম। দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

উখলীতে তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত

গত ২২/০২/২০১১ তারিখ রোজ মঙ্গলবার বাদ যোহর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত উখলী হালকা মসজিদ প্রাঙ্গনে জনাব মোহাম্মদ আব্দুল গফুর প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত উখলীর সভাপতিত্বে এক বিশেষ তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বেশ কিছু এলাকা থেকে আগত মেহমান ও নওমোবাইনগণ এতে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। পবিত্র কুরআন হাদীস ও বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মৌ. মোজাফ্‌ফর আহমদ রাজু। পরিশেষে শৈলমারী ও উখলীর প্রেসিডেন্টগণের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শৈলমারীতে তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত

গত ১২/০৩/২০১১ তারিখ রোজ শনিবার বাদ জোহর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত উখলী ও শৈলমারীর যৌথ উদ্যোগে শৈলমারী মসজিদে ২ পর্বে প্রেসিডেন্ট উখলী ও প্রেসিডেন্ট শৈলমারীর সভাপতিত্বে হাফেজ শাহজালাল এর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে এক বিশেষ তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বেগমপুর, সৈয়দপুর, সাহাপুর পাঁহা ইত্যাদি এলাকা থেকে বেশ কিছু জেরে তবলীগ মেহমান উপস্থিত হয়ে, নবী আগমন, ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন, খাতামান নবীঈন, ওফাতে ঈসা, দাজ্জাল ও তার গাধা ও বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেন। পবিত্র কুরআন হাদীস ও ইতিহাসের আলোকে উত্তর প্রদান করেন মৌ. মোজাফ্‌ফর আহমদ রাজু, মোয়াল্লেম। অনুষ্ঠান শেষে ৫ জন বয়আত গ্রহণ করেন। **-মোয়াজ্জেম আহমদ সানী**

জামেয়া আহ্‌মদীয়া বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন

গত ২৩মার্চ-২০১১ইং রোজ বুধবার সকাল ১০.০০ মিনিট থেকে ১২.৩০ মিনিট পর্যন্ত জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস জলসা উদজ্জাপিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন মওলানা বশীরুর রহমান সাহেব 'ভাইস প্রিন্সিপাল' জামেয়া আহ্‌মদীয়া বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানটি কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়, তেলাওয়াত করেন জনাব তাহের আহমদ দরজা সানীয়া। এরপর উর্দূ নযম পাঠ করেন জনাব আনিসুল ইসলাম। এতে জামেয়ার উস্তাদ জনাব জহির উদ্দীন আহমদ, শরীফ আহমদ, মুহাম্মদ আক্রামুল ইসলাম নির্ধারিত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। অত:পর দরজা রাবেয়ার ছাত্র জনাব ইয়াসিন আহমদ, জাহিদুল ইসলাম শুভ, খালেদ হোসেন সবুজ নির্ধারিত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। মাঝখানে বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব আমিনুল হাসান রাজীব। সব শেষে সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া এবং মিষ্টি বিতরনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি হয় ।

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন

গত ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারী-২০১১ইং রোজ রবি ও সোমবার সকাল ০৯.৩০মিনিট থেকে ১২.৩০মিনিট পর্যন্ত জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবসের জলসা উদযান হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব 'প্রিন্সিপাল' জামেয়া আহ্‌মদীয়া বাংলাদেশ। ২০ফেব্রুয়ারী মুসলেহ্ মাওউদ দিবস অনুষ্ঠানটি কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়, পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব রুহুল আমীন রিয়ন ছাত্র দরজা উলা। এরপর উর্দূ নযম পাঠ করেন সুলতান মাহমুদ আনোয়ার ছাত্র। এতে প্রথমে দুইজন ছাত্র নাবিদ আহমদ লিমন, সৈয়্যদ মুজাফ্‌ফর আহমদ নির্ধারিত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। অত:পর জামেয়ার উস্তাদ জনাব শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন, মওলানা বশীরুর রহমান নির্ধারিত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।
মাঝখানে বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব খালেদ হোসেন সবুজ। ২১ফেব্রুয়ারী মুসলেহ্ মাওউদ দিবস অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন মুহাম্মদ সালাহ্ উদ্দীন এবং নযম পাঠ করেন মোবারিজ আহমদ সানী। এতে তিনজন ছাত্র হাজারী আহমদ আল মুনিম, সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, মামুন-উর-রশীদ। অত:পর জামেয়ার উস্তাদ জনাব জাফর আহমদ, মুহাম্মদ আক্রামুল ইসলাম এবং জহির উদ্দীন আহমদ নির্ধারিত বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। মাঝখানে বাংলা নযম পাঠ করেন শাহ এহসান উদ্দীন।
সবশেষে ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারী দু দিনই সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া এবং মিষ্টি বিতরনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি হয়।

শরীফ আহমদ

শোক সংবাদ

* ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামা'তের দক্ষিণ আহমদীপাড়া নিবাসী মরহুম আব্দুল বারী সাহেবের স্ত্রী হাজেরা বারী সাহেবা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ দিন রোগ ভোগের পর ঢাকাস্থ এ্যাপোলো হাসপাতালে গত ২৭ মার্চ ২০১১ তারিখ সন্ধ্যা ৬-৪৫ মিনিটে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি খুব ধর্মপ্রাণ পরহেজগার মহিলা এবং ওসীয়্যতকারী ছিলেন। আজীবন জামা'তের খেদমত করেছেন। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামা'তের লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি দীর্ঘ দিন কাজ করেছেন। জামা'তের মেহমানদারী করা এবং আহমদী ও অ-আহমদী মৃত্যু মহিলার লাশ ধুয়ানোর কাজ করা তাঁর জীবনের অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁর মৃত্যুর দিন রাত ১০টায় বকশী বাজার দারুত তবলীগে নামাযে জানাযা পড়ানো হয়। অত:পর সবদেহ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নিয়ে যাওয়ার পর ২৮ মার্চ ২০১১ তারিখ সকাল ১০টায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামা'তের নিজস্ব কবরস্থানে নামাযে জানাযা পুণরায় পড়ানো হয় এবং ওসীয়্যতকারীদের জন্য সংরক্ষিত স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি ৩ ছেলে ৬ মেয়েসহ অনেক নাতী নাতনী ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর বড় ছেলে লন্ডন প্রবাসী জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাদী জামা'তের খেদমতে নিবেদিত। তিনি হুযূর আকদাস (আই.)-এর সান্নিধ্যে জামা'তের খেদমতের সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। আল্লাহ্ তাআলা মরহুমা হাজেরা বারী সাহেবাকে জান্নাতুল ফেদৌস দান করুন, আমীন।

-মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

* গত ০৮/০৩/২০১১ তারিখ রোজ বুধবার রাত ১১-৩০ মি: আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ক্রোড়ার প্রবীন মুরুব্বী ও মুসী জনাব আবু তাহের ভূইয়া হার্ড এ্যাটাক্ট করে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) মরহুম ছিলেন সমাজপতি। চরম মোখালেফাতের সময়েও আহমদীদের পার্শ্বে থাকতেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৫ বৎসর। গত ১১/০৩/২০১১ রোজ শুক্রবার বাদ মাগরিব মরহুমের বাড়ীতে এক যিকরে খায়ের সভার আয়োজন করা হয়। মরহুমের আত্মার মাগফিরাত ও শোক সন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ধারণ করার তৌফীক দান করেন এজন্য জামা'তের সবার কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

-এনামুল হক

* আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তেরগাতী, কিশোরগঞ্জ জামাতের প্রবীন সদস্য জনাব ডা: লুৎফর রহমান (মিলন) গত ২৫/০৩/২০১১ তারিখ শুক্রবার বেলা ১০-৩০ মি:-এ সড়ক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স হয়েছিল ৫২ বৎসর। মৃত্যুকালে স্ত্রী, ৪ ছেলেসহ অনেক গুণগ্রাহী রেখে যান। তাঁর এক ছেলে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে অধ্যায়নরত। তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাতের জন্য জামা'তের সকলের কাছে বিনীত দোয়ার আবেদন করছি, মহান খোদা তাআলা মরহুমকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন, আমীন।

-ফুরাদ আহমদ (রিপন), মরহুমের পুত্র